ভি. আই. পি-র বাড়ির লোক

আশাপূর্ণা দেবী

ভি. আই. পি.র বাড়ির লোক □ অমিতাভ দেবী

৫০

ভি. আই. পি.-র বাড়ির লোক

ভি. আই. পি.-র বাড়ির লোক

আশাপূর্ণা দেবী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৪

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
বিভাস রায়
গৌরী প্রিন্টার্স
৬৫, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ৩০.০০

প্রতিষ্ঠিত আলোকচিত্রী

মোনা চৌধুরী-কে

আমাদের প্রকাশিত বই

নকশা কাটা ঘর

ভি. আই. পি-র বাড়ির লোক

ভোর থেকেই ঘন ঘন ঘড়ি দেখে চলেছেন উনি। সেই সঙ্গে দ্রুত ব্যস্ততায় যাত্রার প্রস্তুতিও চলছিল।

এই প্রস্তুতির ব্যাপারে উনি বরাবরই খুব টিপটপ! আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি, তবে ওঁর ওই ঘন ঘন ঘড়ি দেখার মধ্যেই যেন মনের চাঞ্চল্যটি একটু ফুটে উঠছিল মনে হচ্ছিল।

হয়ত চাঞ্চল্যটি প্লেন ছাড়বার টাইম মনে করেই হতে পারে। কারণ আমাদের এই গড়িয়াহাটের বাড়ি থেকে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে সময় তো কম লাগবে না। অতঃপর এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে তো কম ঝামেলা নয়। উনি একজন এম পি বলেই যে একেবারে রেহাই হবে তা তো নয়। 'আইন সকলের ঊর্ধ্বে' এই মহৎ বাণীটিকে ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্যই মান্যতা দেওয়া হয়।

উনি তাই ঘড়ির কাঁটাটার গতি নিয়ে এত বেশি অবহিত হচ্ছেন।

গাড়িখানাকে গ্যারেজ থেকে বার করে রেখেছে অবনী। সেই কোন ভোর থেকে। যদিও সে একবার ক্ষীণভাবে বলতে চেষ্টা করেছিল, "এখন ভোরবেলার রাস্তা, হু হু করে বেরিয়ে যাবে" তবে একটু দাবড়ানি খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল।

এখন ফাঁকা আর শান্ত আছে বলেই তাই থাকবে, এমন গ্যারান্টি আছে? যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও একটা ঘটনার ছুতোয় গোলমাল বেধে যেতে পারে কিনা!

এরপর অবশ্য আর কিছু বলেনি অবনী!

অবশেষে প্রস্তুতি পর্ব শেষ হল। একেবারে যাত্রা মুহূর্তে উনি

খুব ব্যস্তভাবে বললেন, আমার হ্যাণ্ডব্যাগটার মধ্যে ভাজা মশলার কৌটোটা দিয়েছ ইভা ?

আমি আস্তে মাথা হেলালাম।

উনি আরও ব্যস্তভাবে বললেন, আর অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট দুটো ?

আবারও মাথা হেলালাম আমি।

উনি গায়ের শৌখিন সুন্দর স্কার্ফটি পরিপাটিভাবে গায়ে জড়িয়ে গাড়িতে উঠে বসে স্বগতোক্তির মতো বললেন, এভাবে এমন একা কখনও কোথাও যাইনি। তারপর গাড়িতে বসে, জানালায় মুখ বাড়িয়ে বললেন, নার্সিংহোম থেকে সুমন ফোন করেছিল ?

আমি আবার মাথাটাই কাজে লাগালাম। নেতিবাচক ভাবে দু'দিকে মাথা নাড়লাম।

উনি এবার আমার দিকে একটু ভাল করে তাকিয়ে বলে উঠলেন, তুমি এমন ভেঙে পড়া ভাব করছ কেন ইভা ? আমি বাড়ি থাকলাম না, তোমাকেই তো সবদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে! রান্নার মেয়েটা নতুন, কীরকম মতিবুদ্ধি কে জানে! স্টোররুমটা সর্বদা চাবি বন্ধ রাখবে। কে কখন কোথা থেকে এবং কী ব্যাপারে ফোন করল, সেটা নোট করে রাখবে। আর সুমন যেন—ওখানের খবরটা—জানি না ওখানে কী ঘটছে এখন! মহারাজ দেখছেন!

বলে দুটো হাত জোড় করে একবার কপালে ঠেকালেন।

গাড়িটা গর্জন করে ছেড়ে গেল।

নতুন সাদা মারুতিখানা।

আমি বাইরের দিক থেকে ভেতরে আসতেই রান্নার নতুন মেয়ে রাখি বলল, আপনি তো মাসিমার সঙ্গে চা খেলেন না। এখন দিই ? আমি বললাম, এখন থাক! তোদের দাদাবাবু ফিরলে হবে!

ও নাছোড় গলায় বলল, সে এখন কতক্ষণে ফিরবে, তার ঠিক আছে ?

বললাম, তা হোক। তোরা খেয়ে নিগে যা।

'তোরা' মানে, এবাড়ির আধ ডজন খানেক কাজের লোক! আমি যখন প্রথম এ বাড়িতে আসি, তখন এতজন ছিল না। ক্রমশই বেড়েছে। সংসারের কাজটাজও বেড়েছে বেশ কিছু। সার্বিকভাবে না হলেও, হঠাৎ হঠাৎ খানিকটায়! যেমন ওই সাদা মারুতিটা! যেমন শ্বশুর মশাইয়ের বাবার তৈরি এই বাড়িটায় নতুন করে রঙের প্রলেপ। আধুনিক কিছু ভঙ্গি আনা।

উনি যে আজ ভোরের প্লেনেই দিল্লি যাচ্ছেন, এ খবরটা আমি কাল সন্ধ্যাতেই পেয়েছিলাম। পেয়েই আমি চমকে উঠেছিলাম, আর সেই চমকানিটা আমার স্বামীর কাছে প্রকাশ না করে পারিনি!

চমকাবার কারণ কালই দুপুরে আমার শ্বশুরের হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় নার্সিংহোমে দেওয়া হয়েছিল! অবস্থা রীতিমতো সঙ্কটজনক!

আমার ওই চমকানি দেখে আমার স্বামী বিমর্ষভাবে বলেছিলেন, উপায় কী? আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। অধিবেশনটা নাকি বিশেষ জরুরি।

রাত্তিরে কিছু খেয়ে নিয়ে, আমার স্বামী সুমন সমাদ্দার ওই নার্সিংহোমটার কাছাকাছি তার এক পিসতুতো দাদার বাড়িতে গিয়েছিল রাতটা সেখানেই থাকতে। এবং খবরটা দিতেও। ওদের আবার ফোন নেই।

রাতে ওখানে থাকার ব্যবস্থাপত্রটা দিয়েছিলে সুমনের মা, আমার শ্বাশুড়ি। সাংসদ শ্রীমতী সাবর্ণী সমাদ্দার। বলেছিলেন, হঠাৎ কিছু দরকার পড়লে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারবি! ভোরবেলার দিকে বাইরে বেরিয়ে কোনও পাবলিক বুথ থেকে ফোন করে অবস্থা জেনে নিয়ে এখানে একটু জানিয়ে দিতে পারবি। বুঝতেই তো পারছিস, কীরকম মানসিকতায় কাটবে রাতটা! ভোরবেলাই বেরোতে হবে। একে তো—শহরে হঠাৎ হঠাৎ এত গোলমাল, তার ওপর আবার তোর বাবার, দিন বুঝে—।

ঘণ্টা খানেক পরে সুমনের ফোন পেলাম। নার্সিংহোম থেকেই

জানাল, অবস্থা একইরকম। ইনটেনসিভ কেয়ারে রেখেছে। দেখা সাক্ষাতের প্রশ্ন নেই। শুধু কাঁচের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে দেখতে পাওয়া। সংকট এখনও কাটেনি, আদৌ কাটবে কিনা এখনও ডাক্তারের জ্ঞানের পরিধির বাইরে।

ওইটুকুর মধ্যেই ওর মা ঠিকমতো সময়ে বেরোতে পেরেছিলেন কিনা জেনে নিল।

ঘণ্টা দুই পরে সুমন ফিরল।

চা খেল না। খাবার প্রশ্ন নেই। ওর সতুদার বাড়িতে সতুবৌদি দারুণ ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিয়েছেন। বলেছেন নাকি তোমায় আর কবে পাচ্ছি ভাই?

রাখি একটু রাগ রাগ করে বলল, আপনি বৌদি শুধুমুধু চিংড়িপোড়া হয়ে বসে থাকলেন—এখন চা বানাই?

আমার আর এত বেলায় চা খেতে ইচ্ছে করছিল না, তবু ওর রাগের ভয়ে হ্যাঁ বলতে হল। তবে বলে দিলাম শুধু চা।

বলে দিলাম। অবশ্য জানি, ও আমার এ আদেশ মানবে না। সঙ্গে দেবেই কিছু।

সুমন আমাকে চা খেতে দেখে রাখিকে বলল, তাহলে আমায়ও দে এককাপ। আজ তো আর কাজে বেরোচ্ছি না!

চা খেতে খেতে সুমন বলল, ডাক্তাররা কোনও আশা দিতে পারছে না এখনও! সতুদা বেচারি খুব আপসেট হয়ে গেছে। বারবার বলছিল, 'মামার জন্যেই আমার সব। মামা না দেখলে কোথায় ভেসে যেতাম!' আর বলছিল, 'ভাগ্যিস মা নেই। মা বেঁচে থাকলে আজ মামার, এই অবস্থা দেখে কী আপসেট হয়ে যেত তাই ভাবছি।'

শুনে, এত ভাবনাচিন্তার মধ্যেও আমার হঠাৎ একটু হাসি পেয়ে গেল। মার বেঁচে থাকাটা 'ভাগ্যিস' এর পর্যায়ে পড়ে তাহলে সময় বিশেষে? অবশ্যই তিনি তাঁর মায়ের মনোকষ্টের কথা ভেবেই বলেছেন এটা।

তবে আমিও ভাগ্যিস হাসিটা চেপে ফেলতে পারলাম।

আচ্ছা আমি কী এদের এই সর্বদা পলিটিক্স সচেতন বাড়িতে এসে পর্যন্ত একটু কুটিল হয়ে যাচ্ছি? না হলে, মনে হল কেন, আমার স্বামীটি কেমন অবলীলায় ওই কৃতজ্ঞতাটি পরিপাক করে নেন। অথচ সেই সতুদাকে এমন কিছুই করে তুলতে পারেননি তাঁর মামা! সামান্য একটা অনামী কলেজের লেকচারার, দু'একটা টিউশনি করে চালিয়ে নেন এই পর্যন্ত। আর সবচেয়ে বড় কথা তিনি তাঁর মাকে এবং নিজের স্ত্রীপুত্র নিয়ে ছোট্ট একটা ভাড়াটে বাড়িতে থেকেছেন। মা মারা যাওয়ায় হয়ত বাড়িতে একটু জায়গার সংকুলান হয়েছে।

অথচ আমার শ্বশুর মশায়ের বাবার তৈরি গড়িয়াহাটের ওপর এই মস্ত দোতলা বাড়িখানার অর্ধাংশের মালিকই তো হবার কথা সুমনের সেই পিসির। অর্থাৎ সতুদার মা'র।

এবাড়িতে অনায়াসেই তাঁর সংসারেও জায়গা হতে পারত। তিনি তো সেই ছোট্ট ভাড়াটে বাড়িটাতেই মারা গেলেন। তাঁর বাবার শখে তৈরি, বাইরের বারান্দায় মোটা মোটা থাম বসান এই অভিজাত চেহারার বাড়িখানাতেই তাঁর শৈশব বাল্য কৈশোর কেটেছে।

একসময় তিনিও তো 'সমাদ্দার' ছিলেন!

কে জানে কোথায় কী রহস্য?

কোন্ রহস্যটাই বা ভেদ করতে পারি আমি?

এই যে আমার এবাড়িতে এসে পড়া?

এও তো একটা আশ্চর্য ঘটনার তুল্য!

আমার শৈশব-বাল্য-কৈশোর তো কেটেছে বারাসতে একটা জীর্ণ একতলা বাড়িতে। অবশ্য বাড়িটাকে ঘিরে অনেকখানি ফলফুলের বাগান ছিল! সবুজে হাওয়া, যেন তপোবন তপোবন ভাব। সেই তপোবনের মধ্যেকার 'তপস্বী' পুরুষ আমার ঠাকুর্দা।

আমার সেইরকমই মনে হতো। তপস্যায় উজ্জ্বল চেহারা।

সে কথা বললে, দাদু খুব হাসতেন। মাকে ডেকে বলতেন, 'ও বৌমা তোমার মেয়ে কি বলছে শোনো ?'

ডেকে কথা বলতে ওই 'বৌমা'টি ছাড়া আর তো কেউ ছিল না দাদুর। বাবাকে আমি জ্ঞানে দেখিনি। দেখিনি ঠাকুমাকেও। কাকা পিসি কেউ ছিল না আমার।

ঠাকুমা নাকি অনেক দিন অসুখে ভুগেছিলেন। আর শেষের দিকে খুব জেদী আবদার করে একমাত্র হেলেটিকে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে বসেছিলেন। শুনতে পাই বাবার থেকে আমি নাকি মাত্র তেইশ বছরের ছোট। তবুও জ্ঞানে তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দেয়ালে ঝোলানো একটি ছবিই 'আমার বাবা' !

সদ্য গ্র্যাজুয়েট হওয়া, বিশেষ গাউন পরা, টুপি মাথায় সেই ছবিটা একটু বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তেমন ভাল ফটোগ্রাফারের দোকানে না তোলার জন্যে ! তবু দেখেই বোঝা যেত রীতিমতো রূপবান ছিলেন।

দাদু বলেছিলেন, 'ওর ওই শখে আমি একটু হেসেছিলাম। ভেবেছিলাম, গ্র্যাজুয়েট তো মুড়ি মুড়কি, চাল ছোলা ভাজা। তার আবার পোষাক পরে ফটো তোলা। ভাগ্যিস সে কথাটা বলে ফেলিনি। তাহলে হয়ত লজ্জা পেয়ে আর ছবি তোলাতে যেত না ! তোর এই বাবাকে তোর দেখা হতো না। ওপর দেওয়ালে একখানা গ্রুপ ফটোর মধ্যে নিকার বোকার পরা যে ছেলেটাকে দেখতে পাস, সেটাই তোর বাবা হয়ে থাকত।'

কথাগুলো বলবার সময়, দাদু যেন হেসে হেসেই বলতেন।

কিন্তু সেটা কী হাসি ?

তা সে যাক ! যে বাবাকে আমি জ্ঞানে চোখে দেখিনি, তাঁর অভাব আমায় বিশেষ বিচলিত করত না। দাদুই ছিলেন আমার সমস্ত পূর্ণতার প্রতীক !

তবে পরে কদাচ কখনো স্কুলের ক্লাসের মেয়েদের কারো মাকে

দেখলে, মনে হতো আমার বাবা থাকলে, আমার মারও চেহারাটি ওইরকম জ্বলজ্বলে হতো। কপালে লাল টুকটুকে মস্ত টিপ! লাল টুকটুকে পাড় শাড়ি। চোখে মুখে হাসি।

তা সে তো দৈবাৎ।

বারাসাতের সেই তপোবনে, কী আনন্দেই ছিলাম আমি। এখন তাই ভাবি।

কিন্তু সেখান থেকে এই বাড়িতে এসে পড়া।

সে এক দৈব ঘটনা।

ঘটনাটা কেবলমাত্র ঘটনা? না কী দুর্ঘটনা? সেইটাই এখনও ভেবে পাই না। অথচ আবার ভাবতে গেলে লজ্জা পাই।

সুমনের ভালবাসার মধ্যে তো কোনও ঘাটতি নেই!

বিশিষ্ট সমাজসেবী মহিলা সাবর্ণী সমাদ্দার এসেছিলেন আমাদের বারাসাত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভানেত্রী হয়ে।

ক্লাস টেন-এর একটা খুব সুন্দর দেখতে মেয়েকে বারে বারে পুরস্কার নিতে আসতে দেখে সভানেত্রী নাকি একটু নড়েচড়ে বসে স্কুলের কোনও দিদিমণিকে জিগ্যেস করেছিলেন, মেয়েটি কাদের? বাড়ি কোনখানে? গার্জেনের নাম কী?

আর সেই সব প্রশ্নের উত্তর শুনে যেন বেশ প্রীত হয়ে বলেছিলেন, ওর সঙ্গে কে এসেছে? তাঁকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারা যাবে?

সেই সূত্রপাত ঘটনা অথবা দুর্ঘটনার।

সেই সূত্রই খেই খুলে যাওয়া পশমের গোলার মতো গড়াতে গড়াতে একদিন ইভা ভরদ্বাজ নামের মেয়েটাকে তপোবন থেকে ট্রান্সফার করে এনে ফেলল, মোটাসোটা থামওয়ালা অভিজাত চেহারার

খাশ শহরের এই সমাদ্দার বাড়ির মধ্যে!

থামগুলোর চেহারায় যতটা বনেদিয়ানা ছিল, পরিবারের গড়নে ঠিক ততটা ছিল না। ওটা স্রেফ আমার শ্বশুর মশাইয়ের বাবার শখের প্রতীক!

শখ জিনিষটার কোনও মাথা-মুণ্ডু নেই। মানুষটা যে মনেপ্রাণে অভিজাত ছিলেন কিনা তা কে জানে। এমনও হতে পারে নিজে একখানা ভালমতো বাড়ি বানাতে পেরে অভিজাতের কোঠায় ওঠবার বাসনাটি, এই থামের নক্সার পিছনে কাজ করেছিল।

তা সে যাক গে, দেখে দেখে এখন গা সওয়া হয়ে গেছে।

বেড়াতে এসে কেউ কেউ যে বলে, 'এটা একটা দারুণ লস্! থামগুলো না থাকলে সামনের বারান্দাটা দেড়া চওড়া হতো।' সেটাও শুনে শুনে গা সওয়া হয়ে গেছে!

বাড়ি জিনিসটা থাকবার একটা জায়গা, এর বেশি আর কিছু মনে আসে না আমার।

তবে আমার শাশুড়ি এম. পি. হবার পরই বাড়িখানায় নতুন রঙ লাগাবার সময় যখন মিস্ত্রি লাগান হয়েছিল, তখন একবার ওই থামগুলো ভেঙে ফেলার কথা হয়েছিল। শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, যেন একটা দৃপ্ত মহিমাকে ধ্বংস করা হবে তাতে।

শেষপর্যন্ত কিন্তু ভাঙা হল না। বরং ওর কারুকার্যে যেসব টুটাফুটা ছিল, সেগুলো যত্ন করে সারানো হল।

এসব কেন হল, কার ইচ্ছে অনিচ্ছেয় হল তা আমার জানা নেই। যেমন জানা নেই সাবর্ণী সমাদ্দার একটি সমাজসেবী মহিলা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদিকা থেকে কীভাবে তার কর্ণধার হয়ে উঠেছিলেন, আর তারপর কোন রহস্যে একজন এম. এল. এ. হয়ে গিয়েছিলেন, আর তার থেকে একজন এম. পি। বিধানসভার সীমিত ক্ষেত্র থেকে লোকসভার আয়তক্ষেত্রে।

আবার এও জানি না বারাসাত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পুরস্কার

প্রদান সভায় যিনি সর্বাণী সমাদ্দার ছিলেন, তিনি কোন ফাঁকে সাবর্ণী সমাদ্দার হয়ে গেলেন! তবে গেছেন, তা দেখলাম, এই থামওয়ালা বাড়িটায় এসে। সর্বাণী নামটা বড্ড সাদামাটা বলে?

দিল্লিতে নাকি নতুন এম. পি-র ঘরের ব্যবস্থা বদল করতে, আর ওঁর পছন্দ মতো সাজাতে লাখ দু'লাখ খরচ হয়েছিল। আমি এসবের থৈ পাই না। থাকেন তো কলকাতার এই বাড়িটাতেই। আর-- বললে কেউ বিশ্বাস করবে কী না জানি না, তবে বলতেও যাই না কাউকে। বলতে গেলে লজ্জাই করবে, তবে আশ্চর্য এত কাজের মধ্যে সংসারের মূল কেন্দ্রটি ঠিকই কন্ট্রোলে রাখেন। 'কাজের লোকেদের' জন্যে যে আলাদা গুঁড়ো চা আনানো হয়, সেটাই ঠিকমতো ব্যবহার হয় না, ওরা ফাঁকে ফোঁকরে আমাদের 'স্পেশালে' ভাগ বসিয়ে বসে, সেদিকে ঠিক লক্ষ্য রাখেন। যদিও ওই ভাল চায়ের প্যাকেট ট্যাকেট গুলো পকেটের পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না। উপহারে পাওয়া।

বিস্তর স্তাবক জুটেছে তো এখন। বিস্তর রকমের! সেই সূত্রে 'উপহার প্রাপ্তিটা' খুব! সেও বিস্তর রকমের!

আমার শ্বশুরমশাই, সোমনাথ সমাদ্দারকে দেখি, এই উপহার গ্রহণের যেন বিশেষ বিরুদ্ধে। বলেন, 'এগুলি ঠিক নয়। কোনও বিশেষ পোস্টে থাকলেই এমন হয়। এসব অ্যাভয়েড করা উচিত! কারণ তখন আর সেটা উপহারের পর্যায়ে পড়ে না, উপঢৌকনের পর্যায়ে এসে যায়।'

এতে অবশ্য আমার শাশুড়ি বেশ রেগে ওঠেন। বলেন, 'কেউ কিছু দিতে এলে প্রত্যাখ্যান করাটাই কী খুব ভদ্রতা? বলবে নাক উঁচু হয়েছে।' এতে অবশ্য আমার শ্বশুরমশাই একটু হাসেন। বলেন, 'কারা বলতে পারে একথা? তোমার আত্মীয় জন হলে বলতে পারত! কই তাদের তো কখনও কিছু উপহার-টুপহার বয়ে আনতে দেখি না?'

এতে আমার শাশুড়ি আরও রেগে যান, বলেন 'আত্মীয় জন? তাদের তো এখন অহরহ চিন্তা, কী করে কিছু সুবিধে বাগিয়ে

নেওয়া যায়।' ছেলের চাকরি, জামাইয়ের বদলি রদ, ভাইপোকে ভাগ্নেকে অমুককে তমুককে ব্যবসার পারমিট বার করিয়ে দাও, ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাইয়ে দাও, ফেল হওয়া নাতিটাকে পাশ করিয়ে দাও, শালার বৌকে ভেলোরে চিকিৎসা করাতে সরকারি দান পাইয়ে দাও। ভাইরা ভাইয়ের ভগ্নিপতিকে কোনও এক মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দাও।' কেবল দাও দাও, আর দাও! এই যে যখন আমাদের 'নিখিল ভারত দুঃস্থ নারী সঙ্ঘ'র জন্যে সকলে বলেছি, 'সাহায্য দাও, চাঁদা দাও, মুক্ত হস্তে দান করো'—কেউ এগিয়ে এসেছে?

বলতে বলতে খুবই উত্তেজিত হন উনি।

কিন্তু আমার শ্বশুরমশাই এক আশ্চর্য মানুষ। কোনও কিছুতেই উত্তেজিত হতে দেখিনি।

মুখে একটা হাসি হাসি ভাবই সব সময়। তবে হাসিটা কী জাতের তা ঠিক বুঝতে পারি না। চাপা ব্যঙ্গের? না সরস কৌতুকের? না কী মজা পাওয়া ভাবের?

মাঝে মাঝে আবার মনে হয় ওঁর ঠোঁটের গড়নটাই বুঝি ওই রকম।

কিন্তু এই সবই তো আজ 'অতীত' হয়ে গেছে। 'উনি এইরকম না ভেবে' 'এইরকম ছিলেন উনি।'

ইস! না না, এরকম ভাবছি কেন? এখনও তো রয়েছেন তিনি। হঠাৎ বাড়াবাড়ি অসুখ করে না মানুষের? সে অসুখ সারে না? চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে কেন তাহলে?

না, ভাবনাগুলোকে 'বর্তমান' পর্যায়েই রাখা ঠিক। উনি তাঁর এম. পি হওয়া গিন্নির দিকে তেমনি একটি অবোধ্য হাসি হেসে বলেন, 'তা না দিক। তোমার ওই নিঃস্ব সমিতি থেকেই তো বৈতরণী পার হয়ে গেলে? সেই—গরুর ন্যাজ ধরে পার হওয়ার মতো।'

এতে আমার শাশুড়ি ছিটকে ওঠেন। বলেন, তোমার এইসব কথাগুলো এবার থামাও। ঢের সহ্য করা হচ্ছে।

শ্বশুরমশাই তেমনি হেসে বলেন, 'থামাতে হবে তাই না? তা ঠিক, এবার কথা থামাতে হবে।'

কেন বলেছিলেন ?

শুধু শুধু ? এমনি ? না কী ভিতর থেকে অনুভব করেছিলেন, কথাটা থেমে আসছে !

এইত কথা বন্ধ হয়ে রয়েছে কত ঘণ্টা যেন।

কিন্তু আগে থেকে বুঝবেন কী করে ? অসুখটা তো একেবারে আচমকা হয়েছিল। সকাল থেকে যেমন থাকেন ঠিক তেমনিই। একেবারে পারফেক্ট।

চা খাওয়ার পর ওঁর নিজস্ব লেখাপত্র, 'কলকাতার ইতিবৃত্ত'র খাতা নিয়ে বসেছিলেন। তারপর যথা সময়ে স্নানও করেছিলেন। ভাত বাড়া হয়েছিল, তখনি এসে বসবেন, চেয়ারে বসতে গিয়ে হঠাৎ ঘষটে পড়ে গেলেন।

আর এখনও পর্যন্ত পড়ে আছেন। নামীদামী সেই নার্সিং-হোমটার বিশেষ সেই ঘরটার মধ্যে কাঁচের দেওয়ালের আড়ালে।

খুব খারাপ লাগছে আমার। ভীষণ মন কেমন করছে। অথচ আমাকে একবারও দেখতে নিয়ে যাওয়া হল না। নিয়ে না গেলে আমি যাব কী করে ? ওখানে কে জানে কত কী বিধিনিষেধ! নিয়মকানুন। আমি গ্রামের মেয়ে, ভাগ্যের রহস্যে এ বাড়িতে এসে পড়েছি এইমাত্র। আমি কোনও কিছুই জানি না।

অথচ আমার শাশুড়ি ?

উঃ কত কী জানেন উনি। দেখলে আর শুনলে অবাক হয়ে যাই আমি। বিশ্ব সংসারের সবই ওনার জানার জগতে ? উনি যখন ওঁর দলীয় বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, সে সব কথার মর্ম বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই।

আবার এও বোঝবার ক্ষমতা নেই, সেই সব বন্ধু আর প্রসঙ্গের মাঝখান থেকে কী করে কোনও একফাঁকে উঠে এসে উনি আমায় বলেন, 'যে আসবে তাকেই এত আপ্যায়ন করতে হবে না ইভা! বুঝে সুঝে করবে। কতকগুলো বাজে লোকও আসে, তাদের সবাইকে চা পাঠাবার দরকার নেই।'

একদিন সুমনকে বলেছিলাম, 'কে বাজে কে কাজের, কী করে বুঝব ?'

সুমন একটু হেসে বলেছিল, 'বুঝতে শিখতে হবে।'

আমার শ্বশুর সেকথা শুনে বলে উঠেছিলেন, 'ওরে মনু, কোনও কালেই শিখতে পারবে নারে ও বেচারা। আর পারবে না বলেই তো বুঝে ফেলে ওকে আনা! পেয়েও গিয়েছিলেন তো একেবারে আইডিয়াল। ঠিক ওনার মনের ছক মতো।'

একথা কেন বলেছিলেন কে জানে!

কিন্তু উনি এখন আর কথা বলছেন না। আর কোনওদিনই বলবেন কিনা জানি না।

সুমন বলল, আমি এখন আবার যাচ্ছি। দেখি বাবার অবস্থা কী? যদি দেখি একইরকম রয়েছে, তাহলে ফেরার সময় অফিসটা একবার ঘুরে আসব।

অফিস মানে, ওর নিজের ছোটখাটো এক ব্যবসা আছে, তারই অফিস। একদম স্বাধীন।

একবার বললাম, আজ আর নাই গেলে?

সুমন বলল, না না একবার ঘুরে আসা ভাল, কখন কী হতে পারে বলা যায় না। অনেক ঝামেলায় পড়ে যেতে হবে তো তখন।

বেরিয়ে গেল ওর নিজস্ব মোটর বাইকটায়।

আশ্চর্য। কী অবলীলায় কথাগুলো বলল।

কখন 'কী' হতে পারে।

সেই 'কী'টা যে কী সেটা যেন না বুঝেই বলল!

রাখি বলল, দাদাবাবু বলে গেল, তেমন বুঝলে বাইরে খেয়ে নেবে। আপনাকে, আমাদের খেয়ে নিতে বলল। আর বলল, খেয়াল রাখতে দিল্লি থেকে ফোন আসে কিনা!

আমার মনে পড়ল, দাদুর যখন সেই বাড়াবাড়ি অসুখটা করল, দিনের পর দিন আমাদের রান্না হতো না। মা আর আমি যা হোক

কিছু খেয়ে কাটিয়ে দিতাম। সেই খাওয়াটা নিতান্তই প্রয়োজনে। খেতে ইচ্ছেই করত না। দাদু চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন কথা বলছেন না, এই দৃশ্যের সামনে থেকে উঠে সরে গিয়ে অন্য কাজ করতে যাওয়ার কথা ভাবা যেত না।

তালপাতার পাখাখানা অবিরতই হাতবদল হতো মার সঙ্গে আমার।

তখন জানতাম না দাদুর কী হয়েছে। জানতাম অসুখের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। পরে জেনেছিলাম, তার নাম 'কোমা।'

ডাক্তার কবরেজের ক্ষমতার সীমার বাইরে ওই অবস্থা। দম না ফুরনো ঘড়ি যেমন টিকটিক করে চলে, তেমনি ওই শরীরটার মধ্যে একটা যন্ত্র কাজ করে চলেছে।

কত কত দিন তেমন অবস্থায় ছিলেন? অনেক অনেক গুলো দিন। তারপর কেমন করে যেন সেই আচ্ছন্নতা কাটল।

ডাক্তাররা বলল, 'মিরাকল'।

পড়শিরা বলল, 'পুণ্যের শরীর!' 'ভগবানের দয়া।' 'বৌ নাতনীর বরাত জোর।'

তা বরাত জোর বৈকি। দাদুই তো আমায় এই মোটা মোটা থামওয়ালা বাড়িটাতে পেঁছে দেওয়ার উদ্যোগে পাঁচটা মানুষের খাটুনি খেটেছিলেন।

ভাবতে গেলেই পর পর কত ছবিরা আসাযাওয়া করে।

তবু আজ এখন এই বাড়িতে হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল, কোনও এক পড়শী জনের কথায় মা বলছেন, বাড়ির আসল মানুষটাই চোখবুজে পড়ে, ভাতের হাঁড়ি বসাতে ইচ্ছে করছে না কাকীমা। না না। আপনি ওসব করতে যাবেন না। ভাত পাঠিয়ে দিলেই কী মুখে তুলতে পারা যাবে?

আচ্ছা কাঁচের দেওয়ালের আড়ালে গিয়ে পড়লেই কী আর সাংসারের ছায়া পড়ে না।

এই সময় রাখি এসে বলল, ফ্রীজের মধ্যে তো অনেক মাছ ঢোকানো রয়েছে, কোনটা কখন হবে মাসিমা কিছু বলে গেছে?'

তারপর মিনমিন করে বলল, হঠাৎ কিছু এদিক ওদিক হয়ে গেলে তো সবই ফেলা যাবে।

কী বলছিস ?

আমি কী ফস করে একটু জ্বলে উঠেছিলাম ? তাই মেয়েটা খুব ভয় পাওয়া গলায় বলল, না। বলি নাই কিছু !

খানিক পরে সুমন ফিরল। মুখটা একটু যেন উৎফুল্ল। এসেই বলল, মার ফোন এসেছে ?

আমি মাথা নাড়লাম।

সুমন বলল, এতক্ষণতো পৌঁছে যাবার কথা ! আজকাল এয়ারেও যা হয়েছে ! ভোরের আকাশ ! বেশ পরিষ্কার, তবুও হয়ত লেট্।

তারপরই বলল, 'তা' একরকম ভালই হল বলা যায়। বাবার অবস্থা একটু 'বেটার' ! সে খবরটা মাকে জানিয়ে দেওয়া যাবে।

বাবার অবস্থা একটু বেটার ?

হ্যাঁ, তাই শুনলাম। আমাদের ডাক্তারবাবু ডক্টর নাগ, উনি বললেন। এখন আরও খানিকক্ষণ ওখানে থাকবেন। আশা হচ্ছে ক্রাইসিসটা হয়ত আপাতত কেটে যাবে।

আমি দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকালাম।

সুমন একটু হাসল। বলল, মেয়েরা চিরদিন সেই মেয়ে ছেলেবেলায় কোনও সুখবর শুনলে, কি হঠাৎ ভাবনা-চিন্তা করলে, ঠিক এইভাবে হাত জোড় করে কপালে ঠেকাতে দেখেছি ঠাকুমাকে, পরে সব সময় দেখেছি পিসিকে। দিদিমাকেও। আর তোমার দেখছি, এক প্যাটার্ন।

মুখে আসছিল আর তোমার মাকে ?

সেটা জিগ্যেস করা হল না।

ঠিক এইসময় ফোনটা বেজে উঠল।

সুমন লাফিয়ে উঠল।

ওহ। নিশ্চয় মা।

ঠিক তাই।

আমি হাপিত্যেসীভাবে সুমনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। দেখি মুখে কীরকম রেখা পড়ে। কী কী বলে ও।

শুনলাম, নো প্রবলেম? গুড নিউজ তাই না কী? তাহলে তো তোমার পক্ষে অতি উত্তম। কী জন্যে এসেছেন? 'যজ্ঞ' করতে? সেটা আবার কী? অ্যাঁ? কার জন্যে? ও! ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। একটু আগে ফিরলাম। কনডিশানটা একটু বেটার। ও নিশ্চয়। জানাব না? তবে তোমায় কখন পাব সেটাই হচ্ছে কথা। ও আচ্ছা। তাই ভাল। তবে তোমার—এই যাঃ। কেটে গেল।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সুমন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, মায়ের মধ্যে বিশ্বাসটা সত্যি অদ্ভুত। বাবার অবস্থা একটু বেটার শুনেই স্থিরভাবে বললেন, "আমি জানতাম। ঠিক এইসময়ই যখন মহারাজ হঠাৎ দিল্লি এসে উপস্থিত হয়েছেন!"

শুনেই আমার হঠাৎ মনে হল, উনিও কী ঠিক সে সময় সুমনের ঠাকুমা, পিসি, দিদিমাদের মতো দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়েছিলেন? রিসিভার সমেত হাতটাই!

সুমন আরও কিছুক্ষণ ওই 'মহারাজ' সম্পর্কেই কথা বলল। উনি নাকি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুরু। বছরে অধিকাংশ সময়ই উনি 'ফরেনে' থাকেন। ওঁর শিষ্যদের নাম শুনলে থমকে যেতে হয়। দেশের তাবড়-তাবড় নেতারা, কোটিপতি ব্যবসায়ীরা, মেগাস্টার চিত্রতারকারা, ওঁর একটু প্রসাদ লাভে ধন্য হবার জন্যে কাতর। সুমনের মার অনেক ভাগ্য, তাই—। সুমন আলতোভাবে ওঁর বহুবিধ অলৌকিক ক্ষমতার কথাও বলল কিছু কিছু। 'মরাকে বাঁচিয়ে তোলার' পর্যায়ে সে ক্ষমতা।

আমি হঠাৎ আশান্বিত হয়ে বলে উঠলাম, আচ্ছা, তা'হলে তো তোমার মা ওঁকে বাবার অসুখের বিষয় জানিয়ে কিছু করতে পারেন।

কেন যে আমি সুমনের সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার ব্যাপারে শুধু 'বাবা' বললেও মায়ের সম্পর্কে 'তোমার মা' বলে ফেলি তা

বুঝতে পারি না। অনেক সময় এরকম বলে ফেলায় একটু লজ্জাতেও পড়ে যাই। যদি সুমন ওই বলাটা লক্ষ্য করে।

ভাগ্যিস লক্ষ্য করল না। বলল, "তেমন বুঝলে বলবেন নিশ্চয়। এমনও হতে পারে, বলতেও হবে না। তিনি নিজেই বুঝে অভয়-টভয় কিছু দেবেন।"

কথার মাঝখানে জিগ্যেস করলাম, মায়ের ফেরার দিনটা কবে?

ও বলল, ঠিক জানি না। এমনিতে তো কালই অধিবেশন শুরু! যাই একটু রেস্ট নিইগে। খুব টায়ার্ড লাগছে।'

আমি একটু সাহস করে বলে ফেললাম, আমি একবার বাবাকে দেখতে যাব না?

ও বললে, "তুমি? তা যেতে পারো, তবে এখনও তো কাছে যাওয়ার, কী কথা বলার সুবিধে হবে না! আর একটু বরং ভাল হয়ে উঠলে—

"আমার খুব ইচ্ছে করছে।"

সুমন বলল ঠিক আছে। ডাক্তার নাগের কাছ থেকে জেনে নিই। কখন যাওয়া চলতে পারে। তবে কথা-টথা কইবার চেষ্টা কর না।

সে আমি জানি না?

ও বলল, না এমনি বলছি। আসলে—তুমি তো আবার একটু ইমোশন্যাল! হয়ত—দেখেই কেঁদে ফেলবে।

আমি একটু রাগ দেখিয়ে বললাম, কে বলেছে তোমায়। আমি ইমোশন্যাল?

ও একটু হেসে আমার গালে একটা টোকা মেরে বলল। "তুমি যে 'কী' সেটা কী আমায় অন্যলোক এসে বলে যাবে

হাসতে হাসতে ঘরে চলে গেল। বোধহয় রেস্ট নিতে।

আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল, বলে উঠি, 'আমি যে কী' তা তুমি বোঝো?

বললাম না অবশ্য। তাছাড়া ওতো সামনে থেকে সরেই গেল। ওর চলে যাবার সময় যেন দৃষ্টিতে একটা আহ্বান। যেন বলতে

চাইছিল কী? তুমি কী এখন ওই তোমার সংসারের হলুদ পাঁচ ফোড়নের মধ্যেই পাক খাবে? চলে এস না।

আচ্ছা, সুমনতো আমায় খুবই ভালবাসে। আমার কোনও ইচ্ছে অপূর্ণ রাখে না যদি ইচ্ছেটা জানতে পারে।

এই যে কতদিন থেকে ইচ্ছে হচ্ছে একবার বারাসাতে যাই। মাকে দেখে আসি। বলছি না তো।

অথচ কত জায়গাতেই তো যাওয়া হয়ও!

সাবনী সমাদ্দারের দৌলতে তো পেট্রল অঢেল। তাঁর ঝড়তি-পড়তি সময়ে বাড়ির লোকেরা তো অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারে সে সব। সুমনের ছোটমাসি তো হরদম ফোন করে, "এই মেজদি, একখানা গাড়ি হবে?"

হয়েই যায়।

এত হয়, আর আমি বারাসতে যেতে চাইলে হবে না?

হবে নিশ্চিতই। তবু ওই যাওয়াটাই যে কেন হয়ে ওঠে না। সুমনকে বললেই তো হবে। ছোট মাসির মেজদিকেও বলতে হবে না, তবু বলি বলি করে হয়ে ওঠে না।

ইচ্ছে হয়, মানে হতো, শ্বশুর মশাইকে একবার বলে ফেলি, "বাবা, আমি আর আপনি, বাড়ির এই দুজনতো বেকার, চলুন না দুজনে একটু গ্রাম ঘুরে আসি।"

উনি হয়ত বলতেন, 'গ্রাম? কোন গ্রাম?'

আর আমি সেই গ্রামের নাম করলে, হেসে উঠে বলতেন, "তুমি যে দেখছি, দারুণ—কলকাতাইয়া হয়ে গেছ। বারাসাতকে গ্রাম বলছ?"

আমি অবশ্যই চটপট বলে উঠতাম, "আপনার ছেলের তো, তাই ধারণা।"

আর তারপর ঠিকই ওঁর সঙ্গে ঘুরে আসতাম। গেলে মা কী খুশিই হতেন। একা পড়ে থাকেন।

সে সব আর হল না।

হয়ত এ জীবনে আর হবেও না।

মুখফুটে নিজের জন্যে কিছু বলতে না পারার ফলেই আমার অনেক কিছুই হয়ে ওঠে না।

অথচ সকলেই তো আমায় ভালইবাসে। তবু এখানে নিজেকে যেন কেমন ফালতু মনে হয়।

একমাত্র ওই শ্বশুর মশাইকেই আমার 'আশ্রয়' মনে হয়।

আশ্চর্য না ?

এটা তো বলতে গেলে সুমনের ওপর অবিচার। অথচ আমার মানসিকতাই আমায় এইরকম ভাবতে শেখায়।

রাত্রে আবারও দিল্লি থেকে ফোন এল।

আজকের অধিবেশন ভালই হল।

জানাই কথা। স্বয়ং মহারাজ যখন দিল্লিতে উপস্থিত তবে আগামী কালই নাকি চণ্ডীগড়ে চলে যাবেন। অবশ্য দিন তিনেক পরেই ফিরবেন। ওই যে কেন্দ্রীয় কোনও মন্ত্রীর জন্যে 'যজ্ঞ' করছেন, সেই যজ্ঞের সমাপ্তি আহুতি দিতে হবে। লাখ লাখ টাকা খরচের ব্যাপার।

ফোন সেরে সুমন একটু হেসে বলল, যা দেখছি, ওই মহারাজ যতক্ষণ দিল্লির মাটিতে, ততক্ষণ মাও সেই মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবেন।

একটা ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি, শাশুড়িমা তো সবসময় রাখির অপদার্থতা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। এবং সব সময়ই বলেন, ওনাদের সেই সেবামূলক সমিতিটি, উনি এখনও যার প্রেসিডেন্টের পদে আছেন। সেখানে একটু খবর দিতে পারলেই, যথেষ্ট পরিমাণে আইডিয়াল রান্নার মেয়ে, কাজের মেয়ে পাওয়া যেতে পারে। কারণ যে সব ভদ্র দুঃস্থ মেয়েরা নিয়মিত সাহায্যপ্রার্থিনীর তালিকায় আছে, যারা জ্যাম, জেলি, বড়ি, আচার বানাতে পর্যন্ত অক্ষম, অ, আ, ক, খ, ও জানে না, তেমন সব একেবারে নিরাশ্রয় মেয়েরা, কোনও ভদ্রবাড়ি আশ্রয় পেলে, খাওয়া থাকার বিনিময়ে বাড়ির কাজ করে দিতে প্রস্তুত। আর স্বয়ং প্রেসিডেন্টের বাড়ির মতো

ভদ্রবাড়ি আর কোথা পাবে ? কিন্তু সময় করে খবরটা দেওয়া হয়ে ওঠে না বলেই অমন সুবর্ণ সুযোগটি হয়ে উঠছে না। ওই একদম "কিছু না" রাখিটাকে নিয়ে তাঁর জীবন মহানিশা !

অথচ দেখা যায় উনি যখন কলকাতা ছেড়ে বাইরে যান—(অনেকসময়ই যান) তখন রাখি সবই বেশ সুশৃঙ্খলে চালিয়ে দেয়। সবাই সবকিছুই নিয়মিত সময়ে পেয়ে যায়, কোথাও কোনও চেঁচামেচি শোনা যায় না। বাড়ি দিব্যি নিঃশব্দ নিশ্চুপ।

আর সত্যি বলতে—সারা সংসারে, যেন একটা হালকা হাওয়া বয়। কেউ ভয়ে ভয়ে থাকে না। কাউকেই মেপে-জুপে নিক্তির ওজনে কথা বলতে হয় না।

কখনও কোনও সময় আমার শ্বশুর মশাইকে ছেলের সঙ্গে গল্প করতে বসে। হো হো হেসে উঠতেও শুনেছি। আর কী প্রসঙ্গে যেন বলতেও শুনেছি, "ওরে বাবা ! সর্বদা বাতাস ভারি হয়ে থাকবে না ? একখানা জাঁদরেল এম. পির ভার কী সোজা ভার ?"

কিন্তু এবারে ?

এবারেও ঠিক একই অবস্থা। সংসার মসৃণভাবে চলছে। তবে যাবার কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না।

তবে কোথায় যেন একটু ভারি ভারি ভাব।

সেটা বাড়ির সেই দিলখোলা কর্তাটির অনুপস্থিতি। তিনি যে চোখের আড়ালে কাঁচের দেয়ালের আড়ালে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে যাচ্ছেন, সেটা তো সব সময় ভুলে থাকা যায় না !

তা লড়ছেন এখনও পাঞ্জা।

পরদিনই জানা গেল, অবস্থার আবার একটু অবনতি ঘটেছে। ঠিক যেন দুনৌকোয় পা দিয়ে চলার মতো। কখনও এদিকে ঝুঁকি, কখনও ওদিকে ঝুঁকি।

একটা নৌকোর মাঝি খুব কেরামতি দেখাতে পারলেই তুফানটা কেটে যেতে পারে। নৌকোর পালে ভাল হাওয়া লেগে আবার তরতরিয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু কোনও একখানা নৌকোর মাঝি হঠাৎ হাল ছেড়ে দিয়ে আর নৌকোকে না ঠ্যালে ?

তাহলেই তো সেইদিকে কাৎ ! জলটুকে ভরাডুবি।

এখন দু'নৌকোর দুই মাঝির প্রতিযোগিতা চলছে।

হাজার মাইল দূরে থেকেও একজন যথাযথ অবস্থার খবর পেয়ে যাচ্ছেন। আর তিনি শান্তভাবে স্থির বিশ্বাসের আলো কণ্ঠে মেখে বলছেন, এত ভাবছিস কেন রে ? আমি বলছি—সব ঠিক হয়ে যাবে। এ হচ্ছে আমার একটা পরীক্ষা ! শত বিঘ্নের মধ্যেও ঠিকমতো কাজ চালিয়ে যেতে পারব কি না, তাই দেখছেন একজন।

এদিকে তো ওই সুমনের মুখ কখনও গভীর ছায়ায় আচ্ছন্ন। কখনও ঈষৎ উল্লসিত।

এক হিসেবে ওকে আমার ভারি ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। এত সামান্যতেই ও ভেঙে পড়ে। এত সামান্যতেই আবার তাজা হয়ে ওঠে।

আজ আমি নার্সিংহোমে গিয়েছিলাম। কাল সন্ধ্যা থেকে বেশ ভাল আছেন উনি। সর্ববিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে, নাকি ঈষৎ অভিমান ভরে বলেছেন, "ঠিকই আছি বাবা। ঠিকই থাকি। তোদের ডাক্তাররা ওই সর্বদা নিঃশ্বাস মাপামাপি করে করে রোগ বাড়িয়ে দেয়।"

একথা অবশ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আমায় দেখে যে কী খুশি। বলে উঠলেন, "কী গো মা জননী, তোমায় আসতে অ্যালাউ করছিল না ?"

ফলে যা হবার তাই হল। সুমনের আশঙ্কাই ঘটে গেল। তবু আমি উপছে পড়া জলকে অতি সাবধানে চোখের কোণার মধ্যে আটকে রেখে আস্তে বললাম, 'না না, কথা বলা বারণ বলে, আমারই—'

গভীর একটু স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'বুঝেছি।'

নার্স এসে দাঁড়াল।

ওই দাঁড়ানটার মধ্যে ওর বক্তব্য উচ্চারিত হল।

চলে আসতে হল !

আর বাইরে এসে মনে হল, আমিও কী অবোধ অন্ধ। ভাবছিলাম, দেখেই হয়ত বলে উঠবেন, "কী গো মা জননী, এতদিনে বুড়ো ছেলেটাকে মনে পড়ল ?"

সেটাই তো একেবারে স্বাভাবিক হতো। অবশ্যই তার মধ্যে অভিযোগের ঝাঁজ থাকত না, উনি তো তেমন নয়। তবু ওটাই তো বলা শতকরা শত স্বাভাবিকই হতো, উনি তা না বলে, আমার অন্তরের দিককার জানলাটি খুলে দেখে ভিতরের কথাটি বলে উঠলেন।

আমার চোখকে আমি কষ্টে লজ্জা থেকে বাঁচালাম। কিন্তু হঠাৎ অন্য একটা লজ্জা এসে গেল। যদিও সে লজ্জাটা আমার দিক থেকে হবার নয়। তবু হল।

আমার মনে হল, এই মানুষটির সহাবস্থান ক্ষমতা, কী আশ্চর্য রকমের জোরাল। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশটি বছর নাকি উনি, সাবনী সমান্দারের সঙ্গে অবস্থান করে আসছেন।

না না, বাঙালি মেয়ের চিরাচরিত নিয়মে আমি আড়ালে শাশুড়ির সমালোচনা করছি না। আমি শুধু এঁর ক্ষমতার কথা ভাবলাম।

সুমন বলল, দেখে এলে ?

বললাম, হ্যাঁ।

বেশি কথাটথা বলে ফেলনি তো ?

এমন সন্দেহ কেন ? পাহারাদার ছিল না ?

সুমন হেসে ফেলল।

তারপরই সুমন ওর কারখানার কী সব সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে বলতে লাগল আমায়। সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতকগুলো শব্দ কান এবং মগজের বাইরে দিয়ে চলে গেল। তারপর হঠাৎ একটা কথা কানে এল, "এ সময় মা এখানে না থাকায় দারুণ অসুবিধেয় পড়ে গেছি।"

জানিনা মার জন্যে ওর কারখানার কী অসুবিধে। বাবার কথাই তো ভাবছি আমি। যতই যা হোক, তবু উনি ফিরলেই যেন বাঁচা যায়।

কারণ সেই পাহারাদার নার্সটি কী ভেবে পরে আসার সময় আমার কাছে নম্রভাবে এসে কথা বলে আমায় যা বোঝাল, তাতে মনে হল এই ধরনের রোগী যে কোনও মুহূর্তে হঠাৎ টাল খেয়ে যেতে পারে। তাই অতিরিক্ত কেয়ার নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ওঁর সামাজিক পরিচয়টাও তো দেখতে হবে। কোনওভাবেই যেন নার্সিংহোমের বদনাম না হয়।

ও যে আমার কাছে যেচে নম্রতা দেখাতে এল। তার কারণও কী তাহলে একই? ওই সামাজিক পরিচয়?

পরিচয়টা তা'হলে একপক্ষে বেশ সুবিধেজনক।

কিন্তু না। আমার ওই ধারণাটি পরদিনই ভেঙে চুরমার।

কী অসুবিধে। কী অসুবিধে।

হঠাৎ কিনা আমার সেই বারাসাত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মিস্ট্রেস আর সেক্রেটারি আমার কাছে এসে হাজির। ঠিকানাটা নির্ভুল করতে আমার মার কাছ থেকে ঝালিয়ে নিয়ে এসেছেন।

কেন? আমার কাছে ওঁরা? হঠাৎ কী সৌভাগ্য।

না। আমার শাশুড়িকে ধরে করে, ওই স্কুলের জন্যে কেন্দ্রীয় মানব কল্যাণ দপ্তর থেকে একটা অনুদান বার করিয়ে আনতে হবে আমাকে। যাতে বিদ্যালয়ে একটি আলাদা মেরিট স্কলারশিপের ব্যবস্থা চালু করতে পারা যায় এটা ওঁদের দু'জনেরই দীর্ঘদিনের ইচ্ছে।

তা আমি যখন ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী, তখন আমার মধ্যে এটুকু দায়িত্বের প্রেরণা থাকা উচিত। এবং এও ঠিক ওই শ্রীমতী সমাদ্দার নামের মহিলাটি দারুণ ভাল। ওঁরা যখন সেই সেবার স্কুলের তরফ থেকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সভানেত্রীত্ব করতে ওঁর দ্বারস্থ হয়েছিলেন, কীরকম অমায়িকভাবে এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিলেন।

হেড মিস্ট্রেস, আমরা যাঁকে 'বড়দিদিমণি' বলতাম, তিনি হেসে হেসে বললেন, 'আমরা তো বাবা এই মোটা মোটা থামওয়ালা বাড়িটা দেখে ভয়ই পাচ্ছিলাম। উনি কিন্তু খুব সাদাসিধে ভাবে আমাদের

বসালেন, স্কুলে কত মেয়ে, লাইব্রেরি আছে কিনা, মেয়েদের খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে কিনা, এইসব জিজ্ঞেস করলেন, তারপরই রাজী হয়ে গেলেন। তখন কী জানি আমাদের ঘরেরই একটি মেয়ে এই বাড়িটাতে এসে ঢুকে পড়বে। তা এত সুযোগ পেয়ে গেছি যখন তুমি বাপু তোমার স্কুলের জন্য বলবে ওঁকে।'

সেক্রেটারি মশাই বললেন, 'না না, শুধু বলা নয়, করিয়েই তুলতে হবে তোমাকে।'

খুবই বিপন্নভাবে বললাম, কিন্তু উনি তো এখন এখানে নেই।

'জানি, দিল্লি গেছেন।' বলে উঠলেন সেক্রেটারি নিকুঞ্জবাবু। সে কথা জেনেই এসময় আসা ঠিক করলাম। সরাসরি ওনার কাছে প্রস্তাবটা করতে আসার থেকে মাঝখানে একজন আপনজন থাকলে প্রথমে তার কাছে বক্তব্যটা পেশ করে রাখলে, পরে ধরাধরির সুবিধে।

আমি আস্তে বললাম, 'কিন্তু উনি কী ঠিক ওর মধ্যে কোনও ব্যাপারে আছেন?'

নিকুঞ্জবাবু জোরাল গলায় বললেন, 'আরে বাবা ওপরতলার কে যে কোন ব্যাপারে থাকে না থাকে, সে কী তুমি আমি জানি? আমাদের ইচ্ছে, যে কোনও ভাবে একবার আবেদনটি পেশ করা। তারপর লাক আর হাতযশের মহিমা। তবে তোমায় মনে রাখতে হবে স্কুলটা হচ্ছে তোমার প্রাণের জিনিস।

শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। সেই নিকুঞ্জবাবু সেক্রেটারি মশাই। কারো দিকে তাকাতেনই না। আর তাকালেও ভ্রূকুটি ভিন্ন না।

আমি আপাতত এ প্রসঙ্গে ছেদ টানতে বললাম, 'আচ্ছা আপনারা একটু বসুন। আমি একটু চায়ের কথা বলে আসি।'

ওঁরা অবশ্য বলে উঠলেন, 'থাক থাক ওসবে দরকার নেই।' তা সেটা তো আর ধর্তব্য নয়।

যথোচিত আপ্যায়ণ অন্তে, ওঁদের আশ্বাস দিতে হল, 'আচ্ছা উনি ফিরলেই বলব।' তারপর আমার শ্বশুর মশাইয়ের অসুখের কথা

জানালাম। বললাম, এজন্যে খুবই উদ্বিগ্ন রয়েছি। উনি কবে দিল্লি থেকে ফিরবেন, তাই ভেবে দিন গুনছি।

ওঁরা কিন্তু সে কথাটা তেমন আমল দিলেন না। 'ও। তাই তো। তাহলে তো খুব ভাবনার কথা—' বলেই আবারও নিজেদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তবে বিদায় নিলেন।

ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য বেশ বার কয়েক বলে নিলেন, আমিই ছিলাম সে সময় ওই স্কুলের সবথেকে উজ্জ্বল রত্ন। এমনটি আর হল না। এখনকার মেয়েরা, লেখাপড়ায় ভাল হলেও নম্রতা জানে না, বিনয়ী হতে জানে না। উদ্ধত, উগ্র, মুখে মুখে তর্ক করে। অকারণ শিক্ষয়েত্রীদের ডাউন করবার চেষ্টা করে। এখন তো কতৃপক্ষ ছাত্রীদের রীতিমতো ভয় করে চলেন।

আমি শুনে হাঁ!

শিক্ষয়েত্রীরা ছাত্রীদের ভয় করেন !!

আমাদের সেই আমলটার এতখানি পালাবদল ঘটে গেল ?

ক্লাসের মধ্যে তো দূরের কথা, ক্লাসের বাইরে করিডোরে যদি কেউ 'উচ্চহাস্য' করেছি তো তক্ষুনি শাসনবাণী, 'স্কুলটা আড্ডাঘর নয় মেয়েরা। এখানে ম্যানার্সটা মেনে চলতে হয়। আশ্চর্য! বাড়িতে কী কেউ একটুও সহবৎ শেখোনি ?'

এই অবস্থাই তো দেখি চলে যাচ্ছে। আমার শাশুড়ির দৌলতে এ বাড়িতে 'খবর'টা একটু বেশিই আসে। মানুষবাহী খবর। কারণ মানুষের অধিকারটা এ বাড়িতে একটু অধিক। তবু—আজ আমাদের সেই বারাসাত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে 'দিদিমণিরা মেয়েদের ভয় করে চলেন' শুনে নতুন করে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

অফিস থেকে ফিরল সুমন, খুব যেন উৎফুল্ল ভাবে।

এইতো সকালে 'অফিস আর কারখানা' নিয়ে কত কী সমস্যার ফিরস্তি দিচ্ছিল। হঠাৎ সব মিটে গেল নাকি ?

তবে আমি সহজে কিছু জিগ্যেস করি না। ও নিজে থেকে কী বলবে তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করি।

ও টাই-টা খুলে প্রায় আমার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠল, 'দারুণ একটা সুখবর আছে।'

এবার কথা বললাম, কী? তোমার সব সমস্যা মিটে গেল?

ও বলল, 'আরে না, আমার নয়। অবশ্য আমারও বটে। মা আজ অফিসে ফোন করেছিল। আমায় চুপিচুপি জানাল, পরিস্থিতি দেখে অনুমান করছে, মন্ত্রী হবার খুব চান্স রয়েছে মার।'

আমি বোকার মতো ফস করে কি একটা বলে ফেলি।

সুমন হেসে উঠল, 'নাঃ তুমি আর কোনওদিন মানুষ হবে না। এত বলি খুব বেশি করে খবরের কাগজ পড়, তাহলেই সাধারণ জ্ঞানটা বাড়ে। গ্র্যাজুয়েশনটা করতে পাওনি বলে তোমার মনে মনে এত দুঃখ। কিন্তু ওতে কিছুই এসে যায় না। ডিগ্রি-ফিগ্রি কোনও জ্ঞান-গম্যি এনে দেয় না। সর্বদা চোখকান খোলা রাখতে হয়। মাও তো সাধারণ বি. এ পাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু কোথা থেকে কোথায় উঠেছে—ভাব?'

তা সেটাই ভাবতে থাকি। কোথা থেকে কোথায়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় সুমনকে জিগ্যেস করে বসলাম, আচ্ছা মন্ত্রী হলে, কোন মন্ত্রী হবেন? মানব কল্যাণ দপ্তরের?'

ও আশ্চর্য হয়ে বলল, হঠাৎ এ প্রশ্ন?

না এমনি।

'দপ্তর টপ্তর' তুমি বোঝ?

সুমন হাসল। ও বুঝেছি। মা তার ওই 'সমাজকল্যাণ সমিতির' প্রেসিডেন্ট বলে। তাই না?

তারপর আরও একটু হেসে, একটা সিগারেট ধরিয়ে, লম্বা একখানা টান দিয়ে বলল, 'ওসব কোন দপ্তর, কী বৃত্তান্ত জানতে যাওয়াটা এখন হচ্ছে সেই গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দেওয়ার মতো। চান্স আছে এই মাত্র। তবে মহারাজ নাকি 'অভয় মুদ্রা' দেখিয়েছেন!

আমি আবার অবাক।

'অভয় মুদ্রা' মানে ?

সুমন বলল, মানে টানে আমিও জানি না বাবা। মা বলল, তাই। তবে মার বলার ধরণে মনে হল ব্যাপারটা আশাজনক। মানে ওই ওই মুদ্রা-টুদ্রা নাকি শুভ অশুভ অবস্থার প্রতীক।

ও আবার প্যাণ্টের পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বার করল।

বাড়ির হেড দুজন বাড়িতে অনুপস্থিত থাকার কারণে এই একটা মস্ত সুবিধে হয়েছে সুমনের। যখন ইচ্ছে সিগারেট ধরাতে পারছে, আর যেখানে ইচ্ছে বসে টানতে পারছে। ওর ওই আরাম চেয়ারে বসে চোখ বুজে ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গিটা দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে এইটিই যেন ওর একমাত্র কাম্য অবস্থা।

ওই আরাম চেয়ারটা এসেছিল ওর বাবার জন্যে। তা তিনি যে খুব বেশি ব্যবহার করতেন তা নয়। মেরুদণ্ড সোজা করে বসাটাই ওর প্রধান অভ্যাস। বলতেন ওটাও নাকি এক ধরনের যোগ ব্যায়াম।

সুমন ওসব তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়। ও খুব আরাম প্রিয়। যেটা এ বয়সে পরিহার্য।

তা শুধু ওকে দোষ দেওয়াই ঠিক কী ?

আরাম প্রিয় কী আমিও নয় ?

তবে সেটা শারীরিক নয়। মানসিক। মানসিক আরামটাই আমার কাছে যেন স্বাস্থ্যরক্ষক।

এই যে এখন কেবলই মনে হচ্ছে বাবা এসে ওই আরাম চেয়ারটায় বসে আধশোওয়া হয়ে, কাগজ পড়ছেন, হেসে হেসে নার্সিংহোমের পাহারাদারি খবরদারির গল্প করছেন এমন অবস্থাটি এলেই আমার আরাম।

আমার শাশুড়ির একটি 'ঠাকুরের আলমারি' আছে। ওটাই ধরতে হবে ঠাকুর ঘর। দেয়ালে সাঁটা ওই আলমারির দুটো তাক। চকচকে

পালিশ। ওপর তাকটায় ওঁং অর্থাৎ ওঙ্কারের মধ্যে পাক খেয়ে জড়ান একটি রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। নাকি অষ্টধাতুর। মহারাজজী দিয়েছেন ওঁকে।

নিচের তাকে মহারাজেরই একখানি হাফবাস্ট ফটো। রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো। কাঁচাপাকা খানিকটা দাড়ি, বৃহৎ একজোড়া প্রায় জীবন্ত চোখ, আধা প্রৌঢ় এই মুখটিতে হঠাৎ চোখ পড়লেই আমার যেন কেমন ভয় ভয় করে।

অথচ রোজই দেখতে হয়।

কারণ যাঁর ঠাকুর তিনি সন্ধ্যার সময় বাড়িতে না থাকলে, ওর সামনে ধূপ জেবলে দিতে হয়।

তো এখন তিনি হাজার মাইল দূরে। তবে কলকাতায় থাকলেও, সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আছেন, এমন দৈবাৎ ঘটে। কাজেই কাজটা আমার ওপরই থাকে।

থাকে তাতে কিছু না।

একগোছা ধূপ জেবলে ধূপদানিতে বসিয়ে দেওয়া বৈ তো নয়। কিন্তু ওই আলমারির তাকে বসানো ওই বৃহৎ একজোড়া চোখ।

ভয় পাওয়াটা হাস্যকরই।

তবু মনের অগোচরে কথা নেই। ভয় পাই।

অথচ এই ছবি অবশ্য একটু ক্ষুদ্রাকারে আমার শাশুড়ির হারের লকেটের মধ্যে আবদ্ধ আছে। সর্বদা বুক ছুঁয়ে থাকে। সোনার আবরণের অন্তরালে বসে। উনি যখন তখন লকেটটা তুলে কপালে ঠেকান। ডালাটা তুলে চোখের সামনে ধরেন।

আমি ওই চোখের সামনেটাকে অ্যাভয়েড করি। ওপর তাকের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করি। দুটো তাক লক্ষ্য করেই অবশ্য।

ধূপও জবালি দুগাছা।

ক্রমশই কাজটা আমার নিজের মতোই মজ্জাগত হয়ে আসছে। তবু মনের মধ্যে অনুভূতি, কাজটা আসল মালিকের। যেমন অনুভূতি এই সংসারটার সেবা করার কালে।

তো আজ যখন ধূপ জেবলে আলমারি বন্ধ করছি, রাখি ছুটে এল, ও বৌদিদি দাদা এখনও আসে নাই, টেলিফোন।

ওর মতো ছুটে গিয়ে ধরলাম। দিল্লি থেকে স্বর এল। 'কে? ইভা? ঠিক আছে। ভালই হল। তোমাকেই বলবার কথা—শোনো, এখানে—নাকি কোথায় যেন একটা দারুণ শাড়ি মেলা হচ্ছে। যাকে বলে সর্বভারতীয়। আর নাকি বাছাই মাল নিয়ে, কাল একবার ওটায় যাব ঠিক করছি। এই কালকের এয়ার টিকিটটা ক্যানসেল করে দিলাম। বুঝলে? আহা তোমার কী রঙ পছন্দে বল তো?'

আমার? আমার পছন্দের কী? আমার তো কত শাড়ি রয়েছে।

'আহা তা কী জানি না? তবু নেবে তো একখানা? এ হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক মেলা। ছোটাইয়ের জন্যও নিতে হবে একটা। না হলে অভিমান করবে। যা একখানা অভিমানী?

বল বল, কী রং, লাল হলুদ সবুজ? নীল? অরেঞ্জ? কুইক! কুইক!

আমি নিরুপায় হয়ে বলি, 'লাল ছাড়া যে কোনও—'

যাচ্চলে। আমি তো লালই ভাবছিলাম—

কেটে গেল!

চা খেতে খেতে সুমন বললে, 'মা ফোন করেছিলেন? রাখি বলল, তো কী খবর? কাল ফিরছে তো?'

আমি অবশ্যই নেতিবাচক মাথা নেড়ে খবরটা সব বললাম। পরে ওই আমার শাড়ির রং পছন্দটা।

সুমন হতাশ হয়ে বলল, 'ধেত্তারি! ওই সামান্য কারণে টিকিটটা ক্যানসেল করল মা? আরে বাবা এই কলকাতায় সারা ভারতের কোনখানের শাড়ি এসে জড়ো না হচ্ছে? অ্যাঁ? আর কোনটা নেই মার?'

আমি একটু হাস্য ছাড়া আর কী উত্তর দেব?

আমাকে আবার বিচ্ছিরি রকম একটা ভাবনায় ফেলে দিয়ে গেলেন

আমার স্কুলের 'হেড দিদিমণি' আর নিকুঞ্জবাবু!

ওঁদের আর্জির কথা তো জানাতেই হবে আমাকে আমার অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়া শাশুড়িকে। এক সময় যিনি মফস্বলের একটা মেয়ে স্কুলের পারিতোষিক বিতরণের ভার নিতে এককথায় রাজি হয়েছিলেন, সেই তিনিই কী আছেন, এখনো? সেই চেহারাখানির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন বলে?

অথচ যদি আদৌ না বলি, তাহলে আমার সেই প্রাণের স্কুলটার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে না?

স্কুলে ভয়ে ভয়ে থাকতাম বটে, তবু জায়গাটা তো বড় ভালবাসার ছিল। কে জানে সেই—সোমা, স্মিতা, অর্চনা, দেবাঙ্গনা, শাশ্বতী কে কোথায় আছে। বিয়ে হয়ে কে কোথায় ছিটকে গেছে। কার জীবনের কতটা কি পরিণতি হয়েছে কিছুই জানা নেই। অথচ এক সময় একদিন দেখা না হলে প্রাণ বাঁচত না।

এটাই কী তাহলে ভালবাসার তত্ত্ব? চোখের আড়ালে থাকলেই আকর্ষণের তীব্রতা কমে যায়? তাহলে আর 'মন কেমন' কথাটার অর্থ কী? 'বিরহ' মানে কী?

আমার শাশুড়ি তাঁর মৃত্যু শয্যায় শায়িত স্বামীটিকে যদি চোখের সামনে দেখতেন, তাহলে কী 'শাড়িমেলা'য় যাবার জন্যে উদ্‌ভ্রান্ত হতেন? সে মেলা যতই ঐতিহাসিক হোক।

'বাবার অবস্থা তো আবার গড়বড়িয়ে উঠল।'

রাতে খেতে বসে বলে উঠল সুমন।

আমি ভয়ে ভয়ে তাকালাম।

সুমন বলল, 'তখন তোমায় বলিনি, ডাক্তার নাগ সন্ধ্যার পর ফোন করেছিলেন। জিগ্যেস করছিলেন, 'ম্যাডাম কবে আসবেন? পেসেন্টের নাকি হঠাৎই এমন কয়েকটা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে, যেটা সুলক্ষণ নয়।'

আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম। সে কি? সামনের সপ্তাহে ওই

বিশেষ কেয়ার থেকে কেবিনে আনবে বলছিল যে ?

সুমন বিমনা ভাবে বলল, 'বলেছিল তো। হঠাৎই আবার—এদিকে মার ব্যাপারটাও—'

বলে উঠলাম, 'আমি দেখতে যাব।'

সুমন বলল, 'গিয়ে কী হবে ? শুধু কাঁচের দেওয়ালের বাইরে থেকে দেখা বৈ তো নয়।'

'তুমি তো দু'বেলা যাচ্ছ।'

ও বলল, 'সে তো বাধ্য হয়েই যাওয়া। না গিয়ে উপায় নেই। কখন কী লাগবে না লাগবে। তাছাড়া ডক্টর নাগও যে চান উনি যে টাইমটায় না থাকতে পারবেন, বাড়ির কেউ থাকলে ভাল হয়।'

আমি কি বাড়ির কেউ নয় ?

বলে উঠলাম আমি।

সুমন বলল, 'তোমার তো আবার বাড়ির দায়িত্বও রয়েছে। তাছাড়া কখন মার ফোন আসে না আসে।'

ব্যাপারটা হয়েছে তাই। টেলিফোনের লাইনটা হরদম দিল্লি-কলকাতা চলাচল করছে।

শাড়িমেলার পরদিনই আবার সেই বিশেষ 'লগ্ন'। অর্থাৎ ওই 'মন্ত্রীত্ব' লাভের একটা বৈঠক নাকি, বুঝিনা অতসব। সুমন যা বলে তাই থেকে যা বুঝি।

সুমন বলল, 'পলিটিক্স এমন একখানা ব্যাপার, সামান্য এদিক ওদিকে সুযোগ ফসকে যেতে পারে। মানে ওই মোক্ষম সময়টাতেই উপস্থিত না থাকলে—'

কথাটা কখনো পুরো শেষ করে না সুমন। ওর মধ্যে থেকেই যা বোঝ।

অতএব আরও একটা দিন দিল্লিবাস শ্রীমতী সাবনী সমাদ্দারের।

পরদিন এয়ারপোর্ট থেকে জানালেন, প্লেন ছাড়বার সময় হয়ে

এসেছে। আচ্ছা, তোর বাবা একটু ভাল আছে তো ?

সুমন বলল, 'হুঁ'।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নার্সিংহোমে যাবে বলেছিলে তো, চলো এখনই। মা এসে পড়লে তো আবার ওঁকে একটু দেখা-শোনা করতে হবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, দেখাশোনা ? কেন ?

বাঃ ক'দিন পরে বাড়ি ফিরছেন, কেউ একটু রিসিভ করতে থাকবে না ? এমনিতে তো বাড়ির সবাই মিলে এয়ারপোর্টে যাবার কথা। মনে হল তো কিছু 'গুড নিউজ' আছে। মানে আর কী আশাপ্রদ কিছু—ঠিক এই সময় বাবা এমন মুস্কিলে ফেললেন। ডাক্তাররাই যেন বোকা বনে যাচ্ছে। এই একটু আশা হচ্ছে, আবার তখুনি—'

ওর অসহায় ভাবটা দেখে এত মন খারাপ লাগছে।

নার্সিংহোমে যেতে যেতে ও বলল, আমার তো অফিস-টফিস মাথায় উঠেছে। এদিকে আবার সতুদা রোজ দু'বেলা নার্সিংহোমের গেটে বসে থাকছে, আমার সঙ্গে যদি একটু ভেতরে ঢুকতে পায়। ডাক্তার অ্যালাউ করবে না বলায়, শুধু খবরটা জেনে নিয়ে বেচারার মতো আস্তে আস্তে চলে যায়। দেখে অস্বস্তি লাগে।'

আমিও গিয়েই দেখলাম গেট-এর ধারে দাঁড়িয়ে ওদের সতুদা।

সুমন আজ ইচ্ছে করেই, ওর মার ব্যবহারের সেই সাদা মারুতি গাড়িটাতে চেপে এসেছে।

গাড়িটা একটু সমীহব্যঞ্জক তো—

পার্কিং-এর জায়গায় নামতেই দেখি সেই সতুদা।

সুমনকে দেখেই প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে ওঠেন, 'এসেছিস ? বাঁচলাম। কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি কোনও ভাবেই কোনও খবর পাচ্ছি না। বিশাল জায়গা, বিশাল ব্যাপার। কত কত পেসেণ্ট, কেউকার কড়ি ধারে ? কেবলই দেখছি ডাক্তারদের গাড়ি আসছে যাচ্ছে। তাঁরা ঢুকছেন, বেরুচ্ছেন। আবার গাড়ি চেপে চলে যাচ্ছেন।

কাউকে কাউকে আবার বেরোতে দেখছি না। বোধহয় জরুরি রুগীর ব্যাপার। কত সময় তো কতজনের জন্যে কত হাসপাতালে দেখতে-টেখতে গিয়েছি জীবনভোর—এমন গা ছমছম ভাব হতো না বাবা।'

সুমন ইসারায় বেশি কথা বলতে বারণ করল।

আস্তে আস্তে তিনজনেই এগোচ্ছি। প্রথমটায় তো 'রিসেপশানে' গিয়ে বসতে হবে। কত যে জটিলতা। মনে হয় সবাই যেন যন্ত্রের মানুষ।

কথা বলতে নিষেধ, তবু সুমনের সতুদা হঠাৎ একটা চাপা রাগের গলায় বলে উঠলেন 'মামী এখনও দিল্লি বসে আছে?'

সুমনও চাপা রাগের গলায় বলল, 'অকারণ বসে নেই। কাজ আছে বলেই—'

'তা জানি।' বলে চুপ করে গেলেন উনি।

তারপর ডাক্তার নাগের সঙ্গে সুমন একা দেখা করে এল। কী কথা হল জানি না। আমায় বলল, 'তোমার আর এখন দেখা হবে না। খুব ক্রাইসিস চলছে। বোধহয় হালই ছেড়ে দিচ্ছেন ওঁরা।'

আবেগ প্রকাশের জায়গা নয়।

জায়গা নয় উদ্বেগ প্রকাশের। তবু ওই সতুদা বলে উঠলেন, 'আছেন কী এখনও? না—'

সুমন ভারী গলায় বলল, 'সতুদা প্লীজ।'

তারপর কী যে হতে থাকল জানি না। করিডোরে ডাক্তারদের যাওয়া আসা চলছে, নার্সদের অতি নিঃশব্দে দ্রুতধাবন দেখতে পাচ্ছি। সুমন একবার উঠে যাচ্ছে, নীচুগলায় কাউকে কিছু বলছে। আবার ফিরে এসে মাথা নিচু করে বসে থাকছে।

কারুর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না, কেবলমাত্র মৃত্যুর পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

অবশেষে তিনি এলেন।

সেই মহারাজাধিরাজ। ডাক্তার নাগের মাথা নিচু করে দাঁড়ান দেখেই যা বোঝবার বোঝা হয়ে গেল।

আমি মফস্বলের মেয়ে।

গরীব ঘরের মেয়ে।

মহারাজাধিরাজের এমন নিঃশব্দ অভ্যর্থনা দেখিনি কখনও।

তাঁর এসে পড়াটা নিশ্চিত জেনে ফেললেই সেই মুহূর্তে একটা সোরগোল উঠতে দেখা যায়ই। তারপর হয়ত মৃদু গুঞ্জনে তাঁর এসে পড়াকে অভিযোগ জানিয়ে যাওয়া। এবং যে চলে গেল, সে আর কিছু শুনতে পাবে না, উত্তর দেবে না জেনেও তাকে উদ্দেশ্য করে করে বিলাপবাক্য বর্ষণ করে চলা।

এইরকমটাই দেখা অভ্যাস। এ যেন কী এক অন্যরকম। তাই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছি না। ঘটনাটা সত্যি কী ঘটলো? এখনও আছেন? মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে, একটু ক্ষণের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছেন, পরাজয় স্বীকারের দলিলে সইটা করবার জন্যে? নাকি বিজেতা ব্যক্তি পরাজিতকে 'নিজ সম্পত্তি' গণ্য করে নিয়ে চলে গেছে?

অতঃপর প্রকৃত ঘটনা জানা গেল। সুমন আমায় বলল, "এখন আর তোমার এখানে থাকার কোনও যুক্তি নেই। অনেকে মিলে ভীড় বাড়াবার কোনও মানে নেই। তুমি বরং সতুদার সঙ্গে ওর বাড়িতে চলে যাও। ওখানেই আপাতত থাকো কিছুক্ষণ। দেখি কী করা যায়। মাকে তো এয়ারপোর্টেই খবরটা দেওয়া যায় না। শেষে ওঁরও হার্ট অ্যাটাক হয়ে বসবে? 'বাড়াবাড়ি অবস্থা' বলে আমরা চলে এসেছি, এইটাই রাখিকে বলে রাখা হোক। ওকেও আসল খবর বলা চলবে না। পেটে কথা রাখতে পারে না। বরং মাকে একটু চা-টা খাওয়াক ততক্ষণ। তারপর দেখি—এঁরা—মানে ডাক্তার নাগ কী

বলেন। মাকে এখনই এখানে নিয়ে আসা হবে, না যখন বাড়ি ছেড়ে দেবে তারপর—"

সতুদার সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাবার কথায় উনিও আমার মতো বোকার মতো ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলেন, 'হ্যারে মনু এখন কী অবস্থা।'

ওঁরও ঠিক খবরটা স্পষ্ট করে না শোনা পর্যন্ত যেন বিশ্বাস আসছে না।

সুমন একটু চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে বলল, 'বুঝতেই তো পারছ অবস্থা ভাল নয়।'

সতুদা যেন ভয় খেয়ে যান।

নিঃশব্দে সুমনের নির্দেশ পালন করেন।

সতুদার বাড়িতে সাধারণভাবে জীবনে এই প্রথম এলাম আমি। একবার নতুন বৌ-বেলায় ওঁর মেয়ের বিয়েতে এসেছিলাম শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে। সুমন পরে অফিস ফেরত এসেছিল। কিন্তু সে তো এই বাড়িখানায় নয়, বিয়েবাড়ি একটা ভাড়া করা হয়েছিল, সেই বাড়িতে।

এখানে এসে বাড়িখানাকে যেন আমার খুব চেনা চেনা মনে হল। তারপর বুঝতে পারলাম, বাড়িখানা চেনা নয়, বাড়িটার চেহারা চরিত্র সাজ-সজ্জা, এটা যেন বড্ড বেশি চেনা।

এই যে লম্বা টানা একখানা বেঞ্চের ওপর সস্তামার্কা ছিটের, আর শাড়ির চওড়া পাড় জোড়া দিয়ে দিয়ে তৈরি ঘেরাটোপ ঢাকা সারি সারি ট্রাঙ্ক সুটকেস বসানো। তার ওপর বই, কাগজ ইত্যাদিও থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখা টেবিলের বিকল্প মতো, এ দৃশ্য কী আমি বারাসাত থেকে চলে আসার পর আর দেখেছি?

ঘরের কোণে ছোট টুলের ওপর গেলাস চাপা দেওয়া কালো রঙের মাটির কুঁজো একটা। এও কী দেখেছি কোনওখানে? যাবার মধ্যে প্রধানত আমার শাশুড়ির বোনেদের বাড়ি, তাঁরা সকলেই অল্প-বিস্তর এক ধাঁচের।

বাড়ির সাজসজ্জাও প্রায় একই ধাঁচের। রঙিন টিভি, টেলিফোন, রান্নাঘরে প্রেসারকুকার, ওভেন, একজোড়া করে গ্যাসের উনুন। বসবার জন্যে সব জায়গাতেই কিছু না কিছু আরামদায়ক ব্যবস্থা। ফোনের সামনে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে গদি মোড়া শৌখিন বেতের মোড়া।

হয়ত দামের তারতম্য আছে।

এখানে আমি প্রথম দেখলাম টুকটুকে লাল সিমেন্টের তকতকে মেঝের মাটিতে বসে রয়েছেন সতুবৌদি।

মাটিতে বসা। কতদিন এদৃশ্য দেখিনি।

আমাকে দেখে কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আয়। বোস। মাটিতেই বোস। হাসপাতালের কাপড়-চোপড়।'

আমি যেন এই মাটিটায় বসতে পেয়ে বর্তে গেলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল শুয়ে পড়ি। যেমন শুয়ে পড়তাম স্কুল থেকে ফিরে বারাসাতের বাড়ির লাল টুকটুকে সিমেন্টের তকতকে মেঝের ওপর।

মা বলতেন, 'ওরে এই মাত্তর মোছা হয়েছে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

কে শোনে সে কথা ?

উঃ যা গরম। যা রোদ।

পাখা যে একটাও ছিল না, তা নয়। ছিল, দাদুর ঘরে। আর খাবার ঘরে একটা টেবিল ফ্যান।

দাদুর মতে, গরমের দিনে গলদঘর্ম হয়ে খেতে বসাটা ঠিক নয়। আরাম করে না খেলে হজম হয় না। সেইজন্যেই খাবার সময় পাখার বাতাস করাটা ছিল 'কমপালসারি।' মাছি তাড়ানো, হাওয়া দেওয়া।

তবে সে তো পুরুষদের বেলা।

দাদু বলতেন, মেয়েদের খাওয়ার সময় কে কাকে বাতাস করে বল ?

তাই খাবার ঘরে টেবিল ফ্যান।

আর দাদুর ঘরে ? বাইরের ভদ্রলোকেরা যে আসেন সবসময়।

এখানে সতুদার বাড়িতে অবশ্য সেই লাল মেঝের ঘরেই বনবন

করে সীলিং ফ্যান ঘুরছে।

সতুবৌদি একটা বেশ বড়সড় কাঁচের গেলাসে করে কী এনে বললেন, 'একটু খেয়ে নে।'

আমি চমকে উঠলাম।

খাব? এখন আবার খাব কী? খেতে আছে?

উনি বললেন, 'আছে। চিনির শরবতে দোষ নেই।'

সত্যিই স্রেফ চিনির জলে একটু পাতি লেবুর রস। বোধহয় 'এক টুকরো কাগজি লেবু।'

খেয়ে সারা শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

বহুবিধ কোল্ডড্রিংসের বোতল সাজান ফ্রীজের মধ্যেকার চেহারাটা চোখে ভেসে উঠল। মানে আমাদের নিজের বাড়ির।

আমি আস্তে বললাম, 'কুঁজোর জল এত ঠাণ্ডা?'

সতু বৌদি একটু হাসলেন। বললেন, না রে ফ্রীজ আছে একটা ওঘরে। তারই জল। তবে তোর ভাসুরের এক বাতিক। ফ্রীজের জল খাবে না। টনসিল ফুলবে। শোন তো কথা। বিশ্বসুদ্ধু সবাই খাচ্ছে। তা সেই ওনার জন্যেই মাটির কুঁজো।

এইভাবেই হঠাৎ কেমন স্বাভাবিক কথাবার্তা হয়ে আসছিল। যেন একটুখনের জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি এই পরিস্থিতিতে কেন?

একটু বাদে সতুদার ছোট মেয়েটি এসে বলল, 'সোনাকাকু এসেছেন! কাকিমাকে নিয়ে যেতে।'

নিয়ে যেতে!

বুকটা ধড়াস করে উঠল। কোথায় নিয়ে যেতে? কী দেখতে?

অতপর জানলাম কোথায় যেতে হবে!

পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার নাগ, সুমনের প্রায় হিতৈষী গার্জেনের মতো। তিনিই নাকি পরামর্শ দিয়েছেন, 'মরদেহকে তাঁর চিরকালের পরিচিত তিন পুরুষের বাসস্থানের পাড়ায় একবার নিয়ে

যাওয়া নিশ্চিত কর্তব্য।' নিশ্চিত কর্তব্য অন্তত একবারের জন্যে তাঁর সেই থামওয়ালা বাড়িখানার আঙ্গিনায় নিয়ে গিয়ে নামান! আসলে উনিও তো পাড়ারই লোক। তাই বুঝতে পারছেন, এটা নিয়ম। এটা কর্তব্য। তা যেতে তো হবে। কিন্তু সেখানে যদি তখন ম্যাডাম এয়ারপোর্ট থেকে এসে একা বসে থাকেন, অথবা এমনও হতে পারে চা-টা খাচ্ছেন, তখন আচমকা হঠাৎ ওই দৃশ্য দেখলে, কী ভয়ানক ব্যাপার হবে?

খুব অমানবিক হবে সেটা।

অতএব?

অতএব এখন আমি আর সুমন এয়ারপোর্টে যেন যাই মাকে রিসিভ করতে। এবং সেখান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে আসতে আসতে; 'আস্তে আস্তে ভাঙো' নীতিতে খবরটি জানিয়ে, নার্সিংহোম ঘুরে সকলে মিলে মরদেহর সঙ্গে পাড়ায় ঢোকা!

ডাক্তার নাগ আর সতুদা আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে ঘুরে আসা পর্যন্ত নার্সিংহোমের চত্বরেই থাকবেন। কালো গাড়িখানার হেফাজত নিয়ে।

অবশ্য সেটা খুব বেশিক্ষণ হবে না।

কারণ ওই দেহ বার করে নিয়ে যাবার কালে মিটেও মেটে না এমন সব অনেক কিছু ঝামেলা আটকেই থাকে।

কী সব যেন ফর্ম সই করা, কোথায় যেন টাকা জমা দেওয়ার রিসিট নেওয়া, 'বকশিস্' শব্দটা উচ্চারণ না করলেও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্যে কিছু পেমেন্ট করা।

এটা না কী তারা পেয়েই থাকে।

এইসব খুচখাচে সময় যাবেই কিছুটা। ততক্ষণে আমরা এসে যাব।

সবই ডাক্তারের বিচক্ষণ পরিকল্পনা এবং সময়ের ক্যালকুলেশন।

কাজেই সতুদার বাড়ি থেকে উঠে চলে আসতে হল।

সতু বৌদি এক আশ্চর্য ধীর-স্থির মানুষ। একবারও কোনও-রকম হা-হুতাশ করতে দেখলাম না। শুধু একসময় বললেন, মানু-

ঠাকুরপোকে একটু সাবধানে থাকতে বল ভাই। মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে গেল।

হঠাৎ মনে হল আমারও মাথার ওপর থেকে, রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষক ছাতাখানা সরে গেছে। আমি যেন একদম খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

এয়ারপোর্টে শাশুড়ি মার স্তাবকদলের অনেকে এসেছে ফুলের তোড়া নিয়ে। ওঁদের পার্টির তরফ থেকেও দুজন এসেছেন মালা নিয়ে। একজন মহিলা একজন পুরুষ। মহিলাটি বয়স্কা, পুরুষটি কম বয়সী।

এঁদের দুজনের মধ্যেই যেন একটা অনুক্ত উচ্ছ্বসিত ভাব। যেন সুমন যে 'দারুণ সুখবরের' আভাস দিয়েছিল সেদিন, এঁদেরও সেটা জানা হয়ে গেছে। উনি যখন প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন, ওঁকে যেন বেশ মহারানী মহারানী দেখাল। অতি জমকালো চমৎকার শাড়ি একটা পরা। এ কী সেই শাড়ি, মেলার শাড়ি?

ওঁদের উচ্ছ্বাস আগ্রহ মালা তোড়া ইত্যাদির দেয়াল ভেদ করে আমাদের ওপর চোখ পড়তে একটু দেরী হল ওঁর। অবশ্যই মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওঁর আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে!

পরক্ষণেই একটু ম্লান হয়ে গেল।

উনি কী আমাদের দেখেই বুঝে ফেললেন কী ঘটনা ঘটে গেছে! কোথা থেকে আসছি আমরা!

কিন্তু সুমন খুব আস্তে একদম একটা অন্য কথা বলল। বলল, 'মা বোধহয় আমাদের হাতেও একটু ফুলটুল আশা করছিল। না দেখে হতাশ হল। অন্য পাঁচজনের সামনেও তো—'

সুমনের চিন্তার ধারাটা বুঝতে পারলাম।

বাড়ির লোকের হাতেও তো ফুলের তোড়া থাকবে। মুখে থাকবে

আনন্দের অভিব্যক্তি। ভঙ্গিতে থাকবে আগ্রহের উত্তেজনা।

তেমনটা হল না, দেখে ওর মার হয়ত অন্যের কাছে একটু মুখ ছোট হ'ল, এটাই ভাবছে ও।

আমি কিন্তু তা ভাবিনি।

আমি ভাবছিলাম, আমাদের দুজনের শুকনো শুকনো নিষ্প্রভ মুখ দেখে উনি আশঙ্কিত হয়ে অমন মলিন হয়ে গেলেন।

যে যেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত!

বাইরের লোকের দাপট থিতিয়ে গেলে গাড়িতে এসে বসা হল। তখন মা সুমনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এদিকের খবর কী?'

সুমন আস্তে মাথা নিচু করে বলল, 'খুব ভাল নয়।'

'খুব ভাল নয়' আর 'খুব খারাপ' দুটো কথার ওজন এক নয়।

তাই উনি চমকে টমকে গেলেন না।

বললেন, 'আসবার সময় মহারাজজীর সঙ্গে দেখা হল না!'

এটা ঠিক খবর নয়, যেন একটা স্বগতোক্তি। এবং সেটা হতাশাব্যঞ্জক!

তারপর সারা রাস্তাই চুপচাপ।

একবার শুধু যেন একটা ক্ষোভ আর ব্যাঙ্গ মেশানো গলায় বললেন, 'আমাদের গর্বের কলকাতার এই হচ্ছে ভি. আই পি রোড!'

সত্যি রাস্তাটায় আর আগের জৌলুস নেই।

আর চলতে চলতে একসময় অন্যমনস্কতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন, 'কোনদিকে আসছি আমরা সুমন? কোথায় যাচ্ছি!'

উনি নিশ্চিত ছিলেন অবশ্যই বাড়ি যাচ্ছেন।

সুমন খুব কষ্টে নিজেকে সামলে প্রায় অস্ফুট গলায় বলল, নার্সিংহোমে।

'নার্সিংহোমে!'

উনি একদম চুপ হয়ে গেলেন।

পাথরের পুতুলের মতো।

বুঝলাম, বুঝতে বাকি থাকল না ওঁর। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে, গাড়ির চালকের উপস্থিতিতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করার মতো খেলোমি করবেন না। তাই আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তাছাড়া শোকে স্তব্ধতাই তো পবিত্রতা।

কিন্তু কে জানত, সুমনের সতুদা এমন একখানা সিনক্রিয়েট করে বসবেন। ছি ছি!

শাশুড়িমাকে দেখেই কিনা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'পাঁচদিন ধরে কোথায় বসে রইলে মামী? এদিকে তোমার এই সর্বনাশটি হয়ে গেল। ওঃ। মামার থেকে তোমার 'কেরিয়ারটাই' বড় হল?'

প্রথম চিৎকারটা যাহোক সহনীয়। গাঁইয়াদের শোকতাপ প্রকাশের গতানুগতিক ন্যালবেলে ভঙ্গি বলে মেনে নেওয়া যেত।

কিন্তু চিৎকারের দ্বিতীয় আংশটি?

কী লজ্জা! কী লজ্জা! কী অপমানকর!

আমি তাকাতে পারছিলাম না ওঁর মুখের দিকে। তবু বুঝতে পারলাম সেই আত্মস্থ আভিজাত্য ভরা মুখটি গনগনে আগুনের মতো হয়ে উঠল।

কখনও সখনও দেখেছি তেমন রাগে অথবা কারও বিশ্বাসঘাতকতায়। কিন্তু এমন অবমাননাকর কথা কেউ কখনও বলেছে ওঁর মুখের ওপর?

ভয় হল, উনি হয়ত চেঁচিয়ে উঠবেন, 'গেট আউট' বলে। তা কিন্তু করলেন না। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটে বললেন, 'ইডিয়ট'!

সরে এলেন।

তারপর গাড়িতে উঠবার সময় সুমনকে খুব নিচু গলায় বললেন, 'আশা করি আর একখানা নাটক করবার সুযোগ দিতে ওই ইতর ছোটলোকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না?'

সুমন কী বলতে গিয়ে ইতঃস্তত করে বলল, 'না। না!'

অথচ আগেকার কথাবার্তায় জেনেছি যে, ওই সতুদাই হবেন সুমনের প্রধান সাহায্যকারী। বার্নিংঘাটের অবস্থা ব্যবস্থা, করণীয়

ব্যাপার ইত্যাদি সুমন তো কিছুই জানে না। ওই সতুদাই অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

ওঁকে যদি হঠাৎ যাত্রা পথেই বর্জন করতে হয়, তাহলে তো সুমন চোখে অন্ধকার দেখবে, দিশেহারা হবে।

সত্যি বলতে ক্যাওড়াতলার মূল গেট কোনটা, 'কাঠচুল্লি' আর 'বিদ্যুৎচুল্লি'র লাইনে দাঁড়াতে হলে, কোন কোন গেট দিয়ে ঢুকতে হবে, তাই কী জানে ও?

কখনই ওখানে যায়নি সুমন।

অথচ সতুদা?

শুধু আত্মীয়-স্বজন বলেই নয়, পাড়া-পড়শী, বন্ধু সহকর্মী, আত্মীয়দের আত্মীয়, বন্ধুদের বন্ধু যে যখনই ওখানে রওনা দিতে গেছে, সতুদা সেই মহাযাত্রার সহযাত্রী হয়েছেন।

সুমনের অবস্থা যে এখন দারুণ বিপজ্জনক, তা বুঝতে পারছি।

একদিকে মাতৃ অপমানকারী, আবার অপরদিকে 'বিপদে মধুসূদন' অকূলে কূল, পরম দায়ের সময় পরিত্রাতা!

আমি বেচারার মুখটা দেখছি। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছে। ও আমার দিকে একবার তাকাল, তাতেই চোখাচোখি হল।

আচ্ছা, আমি তো ওর স্ত্রী! ওর সুখে দুঃখে সহযাত্রী হতে দায়বদ্ধ। আমার নিশ্চয় ওকে এই বিপদ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত নয়?

আমি সুমনের মায়ের কাছাকাছি ঘেঁষে, যাতে উনি শুনতে পান, এইভাবে সুমনকে উদ্দেশ্য করেই আস্তে বললাম। "সত্যি, উনি এমন অদ্ভুত একটা কাণ্ড করলেন।....ওঁকে অন্য গাড়িতে যেতে বলা যায় না? বার্নিংঘাটের সব কিছু ব্যবস্থা তো ওঁরই হাতে! কার্ড, কাগজপত্র কী সব যেন দরকার লাগে? কার কাছে সে সব?"

সুমন আস্তে মাথা নেড়ে বলে, "সবই তো ওর কাছে। আমি এ সবের কী জানি? ওই তো—"

আমার শাশুড়ি অবশ্যই আমাদের এই অনুচ্চ দাম্পত্য আলাপটুকু শুনতে পেলেন।

গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'সুমন!'

সুমন ব্যস্ত হয়ে তাকাল। উনি বললেন, "এখন যাচ্ছে যাক। তোমাদের যা ব্যবস্থা হয়ে আছে, সেই মতো হোক। তবে ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবার চেষ্টা করবে না!"

সুমনের মুখটা দেখে মনে হল, ওর যেন বুকে চেপে বসা পাথর-খানা নেমে গেল!

"ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে থাক। এখন আপাতত তো অকূলে কূল পেল।"

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে খুঁটটা প্রায় ভিজিয়ে ফেলছিলেন সতুদা। সুমন কাছে গিয়ে বলল, "এখন আমাদের কী করতে হবে?"

সতুদা একবার সশব্দে নাক মুখে বললেন, "কী আর? ডেডবডি নিয়ে একবার বাড়িখানাকে দেখানো! যেখানে পিতৃ পুরুষদের আত্মারা বিরাজ করছেন।....তোদের ওই ডাক্তার নাগ তো আগেই চলে গেল। এতক্ষণে পাড়ার সবাই জেনে গেল বোধহয়।"

হ্যাঁ, পাড়ার সবাই ততক্ষণে জেনে গিয়েছিল।

কিন্তু আমরা কী জানতাম, সেই সবাই এতখানি শোকাহত হবে?

ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই তাঁকে এতটা ভালবাসত? এতখানি শ্রদ্ধা সমীহ করত?

মে মাসের মাঝামাঝি এই ভরা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে রাস্তার দু ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, যে যার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে।

কাঁচঢাকা কালো গাড়িখানা ধীরভাবে যেন বিষাদমন্থর ভঙ্গীতে আমাদের বাড়ির মোড়ে ঢুকতেই, হঠাৎ, ভাঙা, ফাটা, মিহি মোটা, হেঁড়ে সুরেলা, অনেকগুলো গলার স্বর মিশানো একটা ধ্বনি উঠল,

"সমাদ্দারবাবু অমর রহে।"

অতঃপর গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে "মাল্যদান", "পুষ্পার্ঘ প্রদান!"

এ অঞ্চলের, "নব যৌবন পাঠাগার", "শিশুক্রীড়া সংস্থা", "বডি বিল্ডার অ্যাসোসিয়েশান", "দক্ষিণ উপকণ্ঠ সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি" ইত্যাদি ইত্যাদি কত কী যেন!

অবশ্য দূরদর্শনের পর্দায় এ ধরনের দৃশ্য দেখে দেখে তো চোখ মুখস্থ, তবে সে হচ্ছে খোলা ট্রাক! দূর থেকে, নিচে থেকে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা গালাণ্ডে আর 'বোকেয়' ট্রাক বোঝাই হয়ে শবদেহ ঢেকে যায়।

এতো ঠিক তেমন নয়। আর অতও নয়।

কাঁচের গাড়ির জানলা তো হাট করে খোলা যাবে না, যা কিছু প্রদান ওই গাড়ির ওপরেই।

হঠাৎ একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খুদে খুদে সরু সরু শুকনো মতো একগাছা করে মালা হাতে নিয়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে কচি গলায় বলে উঠল, "সোমনাথ দাদু, যুগ যুগ জীও!"

এরা কারা?

এরা নাকি নেহাৎই পাড়ার "গল্পদাদুর আসরের" শ্রোতা নাতিরা!

অবাক হয়ে ভাবতে থাকি, এই নিতান্ত শান্ত আপাত স্থির ধীর মানুষটির সঙ্গে এত কর্মকাণ্ডের যোগ ছিল?

অথচ বাড়ির আমরা সেটা জানতাম না!

গাড়ি বাড়ির চত্বরের মধ্যে ঢুকে এল।

কারা যেন বলল, "ডেডবডি নামান হবে না কী?"

আবার কারা যেন বলল, নামিয়ে কী হবে? বাড়িতে আর কে আছে? আত্মীয়রা এখনও খবর পায়নি। উনিই বাড়িটাকে দেখুন।"

সত্যি, বাড়িতে আবার কে আছে। 'কাজের লোকেরা' দ্বারোয়ান পর্যন্ত গেট ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। রাখিটা গেট ধরে দাঁড়িয়ে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদছে।

আহা আমি কাঁদছিনা কেন ?

আমরা কেউই ? মৃতের স্ত্রী পুত্র ?

আমাদের বোধহয় ওইসব যান্ত্রিক গতির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে থাকতে চোখের স্নায়ুরা শুকিয়ে গেছে !

গাড়িটা ঘুরে আবার পথ ধরতেই দেখলাম জন কয়েক মহিলা বলতে বলতে চলেছে, "অমন মানুষ আর হবে না ! দেবতুল্য ! সঙ্গে দু তিনটে করে বাচ্চা !

কিন্তু এদের কী মহিলা বলা হয় ? এরা ওই কোণের দিকের বস্তির বাসিন্দা না ? এরা হচ্ছে মেয়েছেলে !"

একজনের মুখ নজরে পড়ল। আমাদেরই এক প্রাক্তন বাসন-মাজুনি।....হয়ত আরও যেন একজন।

'প্রাক্তন' আমাদের অনেকই আছে। কারণ, বাড়ির গৃহিণীর রুচি পছন্দর যোগ্য কর্মক্ষমতা ক'জনের থাকে ? অতএব খিটখিটিনির অপবাদ দিয়ে অনায়াসে অন্যবাড়ির থেকে বেশি মাইনের চাকরিটাও ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তারা।

কাউকে ছমাসও টেকতে দেখা যায় কিনা সন্দেহ।

অথচ এরাই বলতে বলতে যাচ্ছে, "এমন মানুষ আর হবে না। দেবতুল্য।"

ওঁকে ওরা কখন বা দেখল ? আশ্চর্য !

শবদেহবাহী সেই কাঁচঢাকা কালো গাড়িখানা গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলল।

তারপর ? সেখানে ? সে এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। আমার জীবনে এ দৃশ্য কখনও দেখতে হয়নি। সব মানুষেরই তাহলে এই পরিণতি ? অদ্ভুত একটা আচ্ছন্ন অবস্থায় ফিরে এলাম সুমন আর তার মা'র সঙ্গে ! সতুদা অন্য গাড়িতে।

কিন্তু ফিরে আসার পর ?

ওঃ। সেও এক ভীষণ যন্ত্রণাময় অবস্থা !

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে....মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে,

নিজেদের মধ্যে পর্যন্ত একটি বাক্যবিনিময় করার ক্ষমতা নেই, কারও। এই অবস্থায় এসে দেখা গেল বাড়ি লোকে লোকারণ্য!

খবর পেয়ে সবাই এসেছেন 'সৌজন্য দর্শনে।'

আত্মীয় পরমাত্মীয়রা, বন্ধুরা পরিচিতজনেরা শ্রীমতী সমাদ্দারের অনুগ্রহ ভাজন স্তাবকেরা আর দলের সদস্যরা অনেকেই। নেতৃস্থানীয়রাও কেউ কেউ!

এমন কী সুমনের কারখানার অফিসেরও দু'একজন এবং কর্মীদলও।....

এরা কার কাছে এসেছে ?

সদ্যপিতৃহীন সুমন সমাদ্দারের কাছে? শোকে সমবেদনা জানাতে?....না কী এম. পি সাবর্ণী সমাদ্দারের কাছে? তাঁর শোকে সমীহ জানাতে?

ভগবান জানেন কে কী জানাতে! তবে আমার তো তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা। অভ্যর্থনা তো জানাতে হবে।

অনেক রাত পর্যন্ত চলতেই লাগল এসব।

আমার শাশুড়ির পরণে এখনও সেই দারুণ জমকালো শাড়িখানা।

উপায় কী?

বদলাবার অবকাশ পেলেন কখন?

সেই অবোধ বুদ্ধু সতুদাটি একবার চুপিচুপি বলেছিল, "হ্যাঁরে মনু, মামী এইরকম বেশভূষাতেই শ্মশানে যাবে?"

সুমন ওই কথাটাই বলেছিল, "উপায় কী?",

তারপর একটু থেমে বলেছিল, "কতজনকে বিয়ের বাসর থেকেও উঠে আসতে হয় জরি বেনারসী পরে!"

সতুদা মেনে নিয়ে বলেছিলেন, "তা বটে! এই তো আমাদের অফিসের একটা পিওনের হঠাৎ মা মারা যাওয়ার খবর শুনে গেলাম। ছেলেটা বড় ভাল, আমায় খুব ভালবাসে। অথচ তার বাড়ির ঠিকানা

জানি না। তাই সরাসরি একেবারে বার্নিংঘাটেই চলে গেলাম। ও মা। গিয়ে দেখি ছেলেটার পরণে চেলিরজোড়, কব্জিতে ছাঁদনাতলার হলুদমাখা সুতো বাঁধা! বাসরে কড়ি খেলতে খেলতে উঠে এসেছে। কপালে তখনও একটু একটু চন্দনের ছাপ। কার কপালটা যে কখন ফেঁসে বসে!"

তা সতুদার মতো বিরোধীপক্ষও মেনে নিলেন তাঁর মামীর ওই জমকালো সাজ।

কিন্তু আমার এ কী দশা হল রে বাবা? আমার কেন, কেবলই মনে হচ্ছে, বাড়িতেই যখন এসে পড়েছেন, একবার ভিতরে গিয়ে সাজটা পাল্টে আসা যেত না?

অবশ্য ঢেউয়ের পর ঢেউ চলছে। আগে থেকে অপেক্ষমান দলেরা বিদায় নেবার আগেই এসে পড়ছে পার্টির পর পার্টি। সবাই ওঁর সামনা সামনি আসবার জন্যে ব্যস্ত। অর্থাৎ একবার জানান দিয়ে যাওয়া, "আমি এসেছিলাম। মুখটা মনে রাখবেন।"

ওদের হুড়োহুড়ি দেখে তাই মনে হল।

উনি যদি বাড়ির মধ্যে নির্জন ঘরে একা শোকাহত হয়ে পড়ে থাকতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ ওঁকে বিরক্ত করতে যেতে সাহস পেত না।

ওঁর ছেলে বৌয়ের কাছেই "সৌজন্য শোক সাক্ষাতের" দলিলটি পেশ করে চলে যেতেন।

কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্য। পরিস্থিতি অন্যরকম হয়েছে।

উনি যে ওই অনেকের সামনেই, দুপাশে পুত্র আর পুত্রবধূকে নিয়ে ওই রাজেন্দ্রাণী মূর্তিতেই গাড়ি থেকে নেমে এলেন।

আর এসে উঠে আসতেই হল মোটা থামে ঘেরা এই মার্বেল মেজে বারান্দায়, মার্বেল মেজে সিঁড়ি বেয়ে।

মার্বেলগুলো অবশ্য এখন মলিন হয়ে গেছে। তা হোক, মরা হাতি লাখ টাকা।

সেই বারান্দাতেই তো জনতার ভিড়।

বহিরাগতদের জন্যে, মোটামুটি কিছু বসবার মতো আসনের ব্যবস্থা থাকে সেখানে। বাকিরা দাঁড়িয়েই রয়েছেন। কেউ বা থামে ঠেস দিয়ে, কেউ বা দেয়ালে পিঠ দিয়ে।

উনি কী ওদের সামনে দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে যাবেন ?

যদি দেখেন তাদের মধ্যে রীতিমতো বিশিষ্টও কেউ কেউ বসে ?

তাই হয় কখনো ?

নাঃ। সত্যিই ওঁর উপায় ছিল না।

অথচ সেই তখন থেকে এই রাত পর্যন্ত আমার কেবলই মনে হচ্ছে, যে লোকই ওঁর সঙ্গে কথা বলছে ওঁর এই আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্যে সহানুভূতি জানাচ্ছে, সেই যেন কেবল ওঁর ওই জমকালো শাড়িখানার দিকে তাকাচ্ছে! তাকাচ্ছে তার সঙ্গে ম্যাচ করা গাঢ় লাল রঙা শার্টিন সিল্কের ব্লাউজটার দিকে। যে ব্লাউজটার হাতা বলতে তেমন কিছু নেই, ওঁর মাজা মাজা অনাবৃত হাত দু'খানার একেবারে গোড়ার দিকে একটু জানান দিচ্ছে মাত্র। সে হয়ত ওই রঙের ঔজ্জ্বল্যে। আর কেবলই এও মনে হচ্ছে, ওঁর কানে দোদুল্যমান 'কানবালা' জাতের গহনাটি বড় বেশি ঝকমকে। কথা বলতে, মুখ মাথা নাড়তে, যেন আলো ঠিকরোচ্ছে!

আচ্ছা। এটা কী ওঁর ছিল ?

কী জানি এসব টুকটাক কত কি আছে ওঁর আমি তার কী হিসেব রাখি ?

কিন্তু সকলে ওই দিকেই বা তাকাচ্ছে কেন ?

ওঁর মুখটার দিকে তাকাবে তো ?

ওই তো প্রসাধন মুছে যাওয়া, কেমন একটা ঘসঘসে শুকিয়ে ওঠা মুখটায় শোকের মালিন্য! মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হওয়ার কারণে ক্ষণে ক্ষণে কপাল টিপে ধরা কোঁচকানো মুখখানার দিকেই তো তাকাবি ? তা নয়, ওঁর শাড়ি গহনার দিকে তাকাচ্ছিস তোরা ?

ঘটনাটা যে কী ঘটছে তা তো জেনেই এসেছ বাবা সবাই। তবে আবার অবাক হবার কী আছে ?

না কী ওটা আমারই চোখের ভুল ?

কেউই ওই শাড়ি গহনার দিকে তাকায়নি। আমিই মনগড়া ভাবে সেটা দেখছি।

তাছাড়া—ওঁদেরও বলি—

এখন এই ভয়ংকর দুঃসময়ে ভিড় বাড়াতে আসাই বা কেন? শোকে সহানুভূতি জানাবার একটা সময়ও তো আছে ?

এ যেন, "আগে কে বা প্রাণ, করিবেক দান, তারই তরে কাড়াকাড়ি।"

ওঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার কথা খেয়াল করবে না ?

কিন্তু জানলাম, ওঁর নাকি ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে প্রাধান্য দেওয়া চলবে না। উনি হচ্ছেন—'পাবলিকের।'

কথাটা আমার আগে জানা ছিল না। অনেক রাতের দিকে যখন ওনার জন্যে একটু খাবার নিয়ে এসেছি, সামান্য কিছু ভাল ফল, দু একটা মিষ্টি, দুটো বিস্কুট, আর একগ্লাস 'কমপ্ল্যান' তখন ঘরে ঢোকার সময় সুমনের ছোটমেসোর গলা থেকে কথাটা উচ্চারিত হতে শুনলাম, "আপনার আর উপায় নেই মেজদি। আপনি তো নিজের না আপনি হচ্ছেন পাবলিকের। এসব অত্যাচার আপনাকে সইতে হবে।"

ছোটমাসি আর ছোটমেসো, আজ রাত্রিরের মতো রয়ে গেছেন।....

বাড়ির ভিড় সরতে, রাখি ওঁদের জন্যে যাহোক করে একটা আলুর তরকারি পটলভাজা আর কিছু লুচি করে রেখেছে, এইবার খাবেন। ওঁদের মেজদি একটু জল মুখে দিলেই তারপর।

মেজদির ছেলেও যৎসামান্য ওই রকম একটু কী যেন আর চা খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

সতুদা চলে যাবার সময়, তাঁকে নাকি ছোটমাসী একবার বলেছিল, "আপনিও তো সারাদিন উপোস করে আছেন। এদের কাজের মেয়েটা কী যে খাবার করেছে—খেয়ে যান না একটু!"

শুনে সতুদা কড়া গলায় বলে উঠেছিলেন, "জানি। লুচি

পটলভাজা বানান হচ্ছিল! গন্ধেই মালুম। তো মামাকে চুল্লিতে গুঁজে দিয়ে এসে, আমি লুচি পটলভাজা খেতে বসব? মামা গেলে, ভাগ্নের "তেরাত্তির অশৌচ!" তাও জানেন না? বলে চলে গেলেন।

তারপরই, ওনাদের পর্দা ফেলা আধ ভেজানো দরজার ওপার থেকে আমার শাশুড়ির রুষ্ঠ ক্ষুব্ধ আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ঝঙ্কার শুনতে পেলাম, "দেখলি তো? নিজের চোখেই দেখলি? সাধে আমি ওকে দুচক্ষের বিষ দেখি? ইতর অসভ্য। অথচ ওই নিধিটিই তোদের জামাইবাবুর ছিল প্রাণের প্রাণ! 'সতু' বলতে অজ্ঞান। একদিকে যদি নিজের স্ত্রী-পুত্র, তো অপরদিকে ওই সতু।....পাল্লাটা ওইদিকেই ভারি।....অথচ সতুকে অভাবের সময়ে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা চলবে না। তাতে নাকি সতুর মানের হানি হবে। উপলক্ষ্যে-টুপলক্ষ্যে উপহারের নামে যা যত দেওয়া যায়।....আশ্চর্য ওই তো— বিশ্রী কটকটে কথা! কী জন্যে যে অমন প্রাণের পুতুল হয়েছিল। মামাকেই কী সমঝে কথা বলত? যা ইচ্ছে শুনিয়ে দিত। বলত, বাড়িতে তো তোমার কোনও কাজটাজ এখন আর নেই বাপু। শরীর ভাল নয়, মৌজে আরাম কর না। রাতদিন পরের গোয়ালে ধোঁয়া দিতে যাও কেন বল তো? তোরা তো জানিস, কোনও কালেই ও বেশি খেতে পারত না। ভাল খাওয়াতেও আগ্রহ ছিল না। তা ইতরটা বলত কী জানিস? 'খাবে কোথা থেকে মামা? আগের জন্মে কাউকে দিয়ে আসেনি যে! তাই এ জন্মে ঘরে সব থাকতে, খিদে বালাই নেই।' কী সব গ্রাম্য অদ্ভুত কথা! অথচ তাই শুনেই মামা মোহিত। মুখে হাসি ধরে না, 'তুই একটা পাগল' বলে আদর দেওয়া। যাক গে ওর কথায় সময় নষ্টয় কাজ নেই। এখন আমার যে কী উভয়সংকট অবস্থা। দু একদিনের মধ্যেই হয়ত আবার একবার দিল্লি না গেলেই নয়। কী যে হবে।"

সুমন সত্যিই খুব মুষড়ে পড়েছে। শুধু ওর বাবা যাওয়ার জন্যে নয়, ওর মার এই গৌরবের সময়, কোনও রকম আহ্লাদ প্রকাশের

অনুষ্ঠান করতে পারছে না বলেও।

সুখবরটা তলে তলে পাকছে।

তবে, এসব ব্যাপার নাকি সহজে এক কথায় হয় না। দপ্তর বণ্টন নাকি একটা দারুণ গোলমেলে ব্যাপার।

এ যেন অনেকটা মেয়ের বিয়েতে পাত্র পক্ষ পাত্রী পছন্দ করে, 'কথা' দিয়ে যাওয়ার পরও—'লাখ কথা।' যে লাখ কথা না হলে নাকি বিয়ে হয় না!

অনেক দিন থেকে মার কাছে যাব যাব ইচ্ছেয় ছিলাম। হয়ে ওঠেনি, মা নিজেই এলেন। এলেন অবশ্য আমার জন্যে মন কেমন করায় নয়। এলেন নেহাৎ সামাজিকতার দায়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেই।

নিজেকে কী উনি সত্যি শ্রীমতী সাবর্ণী সমাদ্দারের 'বেয়ান' হিসেবে সমগোত্র বলে মনে করবার সাহস ধরেন?

তা তো আর ধরেন না?

তবু আসতে হল।

না এলে "লোকে কী বলবে" বলে।

অবশ্য আসার একটা মস্ত সুবিধে জুটে গেছল। আমার সেই "বারাসাত উচ্চ বালিকার" হেড দিদিমণি নাকি এরমধ্যে একদিন মার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, "আপনি তো যাবেনই ওনার সঙ্গে দেখা করতে? আমায় একটু জানাবেন, আমি একটু যাব আপনার সঙ্গে। এ সময় একা যেতে ঠিক ইচ্ছে হচ্ছে না।"

এটা অবশ্য মার পক্ষে সুবিধে হল, সত্যি বলতে—মা-ই ওঁর সঙ্গে এলেন।

মা অবশ্য সামাজিকতা স্বরূপ কিছু নিয়ে আসেননি। শুনেছি এ সময় মেয়ে জামাইয়ের হবিষ্যান্নর জোগাড় ফলটল এসব কিছু দিতে হয়। আনেননি ভালই। এমনিতেই তো এই তিন চার দিন ধরে কেবলই বাড়িতে ফল মিষ্টি এসে এসে বোঝাই হচ্ছে। আত্মীয়দের মধ্যে যে আসছে, সেই আনছে এই সব।

এ এক অদ্ভুত নিয়ম বাবা। শোকের বাড়িতে আসছে, মিষ্টির বাক্স হাতে নিয়ে? ফলের থলি কাঁধে ঝুলিয়ে? এই হল গিয়ে নিয়ম।

অদ্ভুত!

তাই মা কিছু না আনায়, আমার স্বস্তিই হল।

কিন্তু আর এক অস্বস্তি। বড়দিদিমণি নিয়ে এলেন একটি হলদে গোলাপের তোড়া।....লাল গোলাপ আনতে বোধহয় বাধা লেগেছিল।

তাহলেও গোলাপের তোড়া তো? সেটা ওঁর হাতে তুলে দেওয়া?

দেবার সময় অবশ্য বলতে লাগলেন, "ভগবান এমন সময় এমন করলেন। কী আর বলব? একটা মস্ত গোলাপ ঝাড়ই তো আনার কথা। আপনি আমাদের গৌরব। আর আমার ঘরের মেয়ে, আপনার ঘরে এসে ঢুকেছে. সে হিসেবে আপনি তো আমাদের পরমাত্মীয়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর বললেন, "কাগজে শুভ খবরটি জানলাম। আমাদের প্রত্যাশা বেড়ে গেল। যাক এখন এ সময় আপনাকে বিরক্ত করব না। আপনার পুত্রবধূর কাছে আমাদের আর্জি পেশ করে গেছি।"

আর মা? আমার মা?

মা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসছিলেন, কী ভাগ্যি সেটা প্রকাশ হল না। হলে কেলেঙ্কারের একশেষ হতো।

আড়াল নেই, তবু একটু আড়ালে গিয়ে চুপি চুপি আমায় বলেন কিনা, "এ সময় আমার তো মেয়ে জামাইয়ের নাম করে ফল মিষ্টি ঘি মাখন, ঘাটে ওঠার কাপড় চোপড় দেবার কথা। কিন্তু তোদের যুগ্যি আর আমি কী দেব? এই টাকাটা রাখ, কাউকে দিয়ে ফলটল আনিয়ে নিস!"

তা কয়ে দেখলাম, পাঁচশো টাকা।

এই টাকাটা জোগাড় করতে মার কী অবস্থা হয়েছে, ভেবে শরীর হিম হয়ে গেল।

হাত জোড় করে বললাম, "দোহাই মা, এসব করতে এস না। তোমার জামাই শুনলে আমার ওপর রেগে যাবে।"....

মা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "এই জন্যেই বলে তেলে জলে মেশাতে চেষ্টা করতে নেই। গরীবে বড়লোকে কখনও আত্মীয়তা হয় না। তবে থাক।"

আর অনুরোধ উপরোধ করলেন না!

কিন্তু তারপর?

শুনতে অবিশ্বাস্য। মা চলে যেতে ছোটমাসি অন্যের শ্রুতি-গোচর করেই বলে উঠলেন, "কী গো মেজদি। তোমার বেয়ান মেয়ে জামাইয়ের এই মহাদায়ে কিছু দিল টিল না? জানে না নাকি?"

তা মেজদি কী উত্তর দিলেন, তা শুনতে পেলাম না। ওই মাসির কথাই শুনতে পেলাম, "কী জানি বাবা। গ্রাম গঞ্জের দিকেই তো এসব নিয়ম টিয়ম বেশিই জানার কথা!"

তবু আমি স্বস্তিতেই নিঃশ্বাস ফেললাম।

মা যদি অকিঞ্চিৎকর কিছু নিয়ে আসতেন, বা তাঁর প্রস্তাব মতো ওই পাঁচশো টাকা ওঁদের সামনে ধরে দিয়ে বসতাম?

ও বাবা!

বারাসাতের ইভা নামের অকালে বাপ মরা মেয়েটার যদি এরকম মোটা থামওয়ালা বাড়িতে বিয়ে না হয়ে, একটা বাঁশের খুঁটি চালাঘরের বাড়িতে বিয়ে হতো কী ক্ষতি হতো?

তবু সুমন তো আমার কাছাকাছিই আছে। অথচ কেন এমন ঢিলে ঢিলে বাঁধন?

আসলে সুমনের অবস্থাও অনেকটা আমারই মতো। এক ভি. আই. পি-র ছত্রছায়ায় থাকতে থাকতে, ওর নিজস্ব যে কোন সত্তা আছে, তা যেন ভুলেই গেছে।

এই যে—ওর বাবার কাজকর্ম করবে, সেটা কী ভাবে, কতটা করবে তাও নিজে ভেবে ঠিক করতে পারছে না! সেই মায়ের মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে।

মুখচেয়ে বসে আছেন, মায়ের প্রধান উপদেষ্টা ওই ছোটমাসি ছোটমেসোর! ওঁদের মাধ্যমে মায়ের ইচ্ছা জানতে পারা।

টাকাপত্র যে ওর নিজের নেই, তা তো নয়। 'কারখানাটা' নাকি ভাল চলে। তাছাড়া, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও তো রয়েছে। ভবিষ্যতে তো ওটা একটা মন্ত্রীপুত্রর বিজনেস হবে।

এদিকে বাড়িতে অবিরত অভ্যাগত আসার বিরতি নেই। অনাহত ধারায় চলছে। রাখিটা চা বানাতে বানাতে, আর আমি খাবার গোছাতে কাহিল হয়ে যাচ্ছি।

সেকালে—গাঁইয়ারা না কী বলত, অশৌচের বাড়িতে পানাহার নিষেধ। একালে সভ্যসমাজে ওসব নিষেধবাক্য উঠে গেছে!

তা উঠে গেছে অনেক নিষেধ বাক্যই।

এই যে—ঠিক আমার শ্বশুরমশায়ের শ্রাদ্ধের দিন, তাঁর সদ্য বিধবা স্ত্রীকে, জরুরি কর্মোপলক্ষে আবার দিল্লি ছুটতে হল?

কী উপায়?

আমার অমন অভিজাত শাশুড়িও নেহাৎ গাঁইয়াদের মতো কপালে করাঘাত করে বলে উঠলেন, "দেখছিস ছোটাই আমার কপাল?....কী দিনে কী দিনটি পড়ল? হবেই এরকম সেই আশঙ্কা করছিলাম। তোদের জামাইবাবু কোনদিনই তো আমার কাজের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করত না। কখনও সাহায্য সহায়কের ভূমিকা নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াত না, বরং যেন সব কিছুই ঠাট্টাতামাসার চোখে দেখত।....তা আমার দুরদৃষ্ট সাফল্যটা দেখিয়ে দিতে পারলাম না। চিরদিন বিরোধী পক্ষের মতো ছিল, মরেও বিরোধীতা করে গেল। ঠিক আছে—যার পিতৃদায়, সেই গলবস্ত্র হয়ে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানাক, নেমতন্ন করুক, সমারোহ করে কাজ করুক, আমার কী? আমি কে?"

আগুনের মতো ফেটে যাচ্ছিল তাঁর মুখ।

অতঃপর—

তার ওই সবসময় পাশে থাকা ছোটাই আর তার স্বামী—নাকি পুরোহিত পণ্ডিতদের ব্যাপারটা বিস্তার করে খুলে বলে, বিধান চেয়ে

নিয়ে এসে জানালেন, শ্রাদ্ধকার্যের সময় স্ত্রীর উপস্থিতি নাকি কম্পালসরি নয়।....এমনও তো কত হয় স্ত্রী এমন সময়, অন্তঃসত্ত্বা থাকেন অথবা সূতিকা গৃহে। কাজেই পুত্র যখন সক্ষম এবং উপস্থিত থাকছেন, আর খরচাপাতির ব্যাপারে কোনও কার্পণ্য করছেন না, তখন কিছুই অঙ্গহানি হবে না।

আমি তো বোকা সোকা মানুষ। জগতের কতটুকুই বা জানি? আর কতটুকুই বা দেখেছি।....তবে, এটা লক্ষ করেছি—আইন আর 'শাস্ত্র' দুটিই এক গোত্রের। ওদের মধ্যে যতই কড়াকড়ির বাহার, ততই ফাঁকির কারবার।

যেন বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো!

প্রতিনিয়ত শত শত সহস্র সহস্র পাপী পাতকী আইনের আলগা শেকলের ফাঁক দিয়ে গলে আসছে, কোথাও কিছু প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না।

কোটিপতিরা কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি দিয়ে দিব্যি তরে যাচ্ছে। অথচ একটা গরীব গেরস্থর দেয় কোনও কর একবার বাকি পড়লেই তার ভিটেমাটি ক্রোক।

উঁচুতলার জনেরা অনায়াসেই পণ্ডিত পুরোহিত বর্গের কাছ থেকে শাস্ত্রের বিবিধ অনুশাসনের জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারেন। নিচুতলাররা সেই জালে জড়িয়ে মরে হাঁসফাস করে।

সেই জন্যেই বুঝি জনগণের মধ্যে থেকেই কোনও কোনও জনের ভি আই পি হয়ে ওঠবার প্রেরণা জাগে, আর তার জন্যে জাগে লড়াইয়ের প্রবল প্রচেষ্টার প্রেরণা। আসবে না কেন? ভি আই পি-র যে সাত খুন মাপ।

কাজেই সুমন যখন পিতৃ পুরুষকে পিণ্ডদান করতে, (মাথা ন্যাড়া করে অবশ্য নয়) সমাদ্দার বংশের সাত পুরুষের নাম আওড়ে চলেছে, তার মা করুণ মুখে জানিয়ে যান তাকে, "চলি রে! বেশি বেলা অবধি উপোসে থাকিস না।"

আর সুমন মলিন মুখে ছলছলে চোখে বলে, "একবারও আমি তোমায় এয়ারপোর্টে পেঁছিতে যেতে পেলাম না।"

ছোটমেসো দরাজ গলায় বলেন, ঠিক আছে ইয়ংম্যান। ঠিক আছে। আমি তো যাচ্ছি। অলওয়েজ মনে রেখ আমরা দুজনে তোমার সঙ্গে আছি।"

ছোটমাসি দেখলাম, তাঁর মেজদির একখানা দামি শাড়ি পরিধান করেছেন। মেজদিও প্রায় তারই কাছাকাছি।

উনিও কী দিল্লি যাচ্ছেন নাকি? ওই ছোটাই?

যাচ্ছেন! একজনও 'নিকটজন' সঙ্গে যাবে না ওঁর এই পরমক্ষণে? আগামী কালই তো—ওঁর মন্ত্রীত্বে অভিষেক।

ছোটমাসি যাত্রাকালে আমায় বললে, দ্যাখ তো কী মুস্কিল। কোথায় তুমি যাবে সেজে গুঁজে তোমার শাশুড়ির সঙ্গে এই গৌরবের ভাগ নিতে, তা নয়, আমি! কে না কে?

আমি আবার ওসব কথার ঠিক গুছিয়ে উত্তর দিতে পারি না। তাই শুধু 'না না সে কী। আপনিই তো—বলে থেমে গেলাম। বলা উচিত ছিল, আপনিই তো আসল। তাই না?

কিন্তু ভাবতে থাকি—ওই কে না কে রাই আসল সুখী। দায়ভার নেই, সুখের ভাগটি জোটে। কিন্তু ভি আই পি-র বাড়ির লোক হওয়ার মতো ভয়াবহ আর কী আছে।

"ওই বারাসাত উচ্চ বালিকার" হেড দিদিমণির মতো, 'কত শত জন' যে আমার কাছেই এসে ধর্না দিতে আসবে তা কে জানে।....

আমার শ্বশুরমশাই, সেই যে কী একটা প্রবাদ বচন বলতেন, "গরুর ল্যাজ ধরে বৈতরণী পার" নাকি, তার মানেটা বোধহয় বুঝে ফেলতে হবে ক্রমেই।

আর সুমন?

ও বেচারী সর্বদাই যেন নিজের কর্তব্যে ত্রুটি ঘটে যাচ্ছে। এইভাবে মরমে মরে থাকে। ওর মায়ের উপযুক্ত, সম্যক সমীহ করে উঠতে পারছে না ভেবে হতাশ হয়ে যায়।....

এদিকে আবার যাবার আগে উনি একফাঁকে সুমনকে বলে রেখেছেন, "পাঁচজনের কথায় নেচে অর্থে সামর্থে ডুবতে বসিসনে!

যা করবি রয়ে সয়ে নিজের চিন্তায়।"

আর আমায় বলে রেখেছেন, "কাজের বাড়িতে সবদিকে একটু খোঁজ রেখ ইভা। অনিষ্টকারীরা তো সুযোগের আশায় ওৎ পেতে থাকে। ভাঁড়ারের চাবিটি একবারও নিজের কাছ ছাড়া কর না। আর সুমনের ওই সতুদার গুষ্ঠি যেন—যাক গে বেশি কথার সময় নেই। যা করবে বুঝে সুঝে কর। আর ওই রাখিটাকে যেন আসকারা দিয়ে মাথায় তুল না। আর দেশে যাবার আবদার করলে খবরদার ছাড়বে না। আমি ফিরে আসার পর একটা পার্টি গোছের তো দিতেই হবে! আর নির্বাচনের সময় যে সব ছেলেরা খেটেছে, তাদেরও অন্তত একদিন—"

ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে উঠে পড়লেন, সেই ওঁর সাদা মারুতিতে।

ছোটমাসিও সঙ্গে সঙ্গে। নিচুগলায় বললেন, "এ গাড়িটা তোর বেশ পুরনো হয়ে এসেছে মেজদি।"

মেজদি হাতটা তুললেন।

হঠাৎ এ প্রসঙ্গ থাক।

গাড়ি ছেড়ে দিলে ফিরে এলাম, যেখানে সুমন কলাপাতার টুকরো সাজিয়ে সাজিয়ে পিণ্ডদান না কী করছে।

আসলে এমন একটা সমাজের মধ্যে বসবাস করছি আমরা যেখানে সাবেককালের বিধিনিয়ম সবকিছু আছে, আবার নেইও।

অভিজাতদের দলে উঠে গেলে, ওই সবকিছু মানা, এবং না মানা, যেন একটা লীলা!

যাকগে ওসব তত্ত্বকথা। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের দরকার কী? তবে একজন অভিজাতের সঙ্গে একটা অনভিজাতকে এক সঙ্গে বাঁধা হয়ে থাকতে হলে, সমস্যা ঘোরতর!

এই যে—উনি বলে গেলেন, বুঝে সুঝে চলতে। কিন্তু তার জন্যে যে এ বেচারীর কী বুঝতে হবে তার হিসেব আছে?

'রাখিকে কিছুতেই ছাড়া চলবে না' বলে কড়া নির্দেশ দিয়ে গেলেন। অথচ কাল সন্ধ্যে থেকেই রাখির বাবা গ্রাম থেকে এসে বসে

আছে, মেয়েকে নিয়ে যাবে বলে। মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। নেহাৎ আজ এখানে কর্তাবাবুর কাজ। তাই দুটো দিন এখানেই থেকে যাবে। যজ্ঞি মিটলেই মেয়ে নিয়ে চলে যাবে।

কে বাধা দেবে ?

আমি তো আর ভি আই পি নই যে আমার চোখ রাঙানিকে ভয় করবে, নাকি তাও ভয় না করলে পুলিশের ভয় দেখিয়ে, ভিটেবাড়ি থেকে উৎখাত করার এ ভয় দেখিয়ে—কব্জায় আনতে পারব ?

আমি তো মাত্র ভি আই পি-র বাড়ির লোক! রাংতার পুতুল।

ভরসা সুমন।

অস্বীকার করে উপায় নেই লোকটা আমায় সত্যিই ভালবাসে!

সেই জ্বালাতেই এই মোটা থামওলা বাড়িটাকে আঁকড়ে পড়ে আছি। তবে—ক্রমশ, ওই লোকটা যদি—অন্যদিকে বাড়তে বাড়তে নকল ভি আই পি হয়ে ওঠে ?

থাক। তখনকার কথা ভেবে এখুনি মন খারাপ করে কাজ নেই। আপাতত চোখকান বুজে এই পরিচয়েই কাটিয়ে চলতে হবে। এখনকার এই মাননীয়া 'ভি আই পি-র, বাড়ির লোক!'

তমোনাশের ভ্রমনাশ

স্কুলে বেরোবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ঘরের দৃশ্যটির দিকে-একবার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল বিদিশা। যেমন রোজই নেয়! তারপর চারিদিকে নানান আলতু ফালতু জিনিস ছড়িয়ে, ঘরের মেঝেয় বসে থাকা তমোনাশের দিকে একটু তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, ফিরতে দেরী হলে ভাবনা করতে বোসো না। ইচ্ছে হলে চা খেয়ে নিও। রাস্তার অবস্থা তো জানোই। একবার জ্যামে পড়লেই তো হয়ে গেল। ঠিক সময়ে নাওয়া খাওয়া করে নিও।

যেমন রোজ বলে!

অর্থাৎ গত একবছর ধরে যেমন বলছে, 'নবনন্দন বিদ্যামন্দিরের' প্রধান শিক্ষিকা বিদিশা ব্যানার্জি। এক বছর আগে তো পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্য ছিল।

তখন কী তমোনাশ ভাবতে পারত এই বেলা দশটার সময় সে তার কাটুম কুটুম বানাবার যন্ত্রপাতিসমূহ চারিদিকে ছড়িয়ে মাদুর বিছিয়ে ঠুকঠাক করছে।

প্রথমে অবশ্য মাদুরটা বিছোয়, কিন্তু ক্রমশ সেটা নড়তে নড়তে আর সরতে সরতে একপাশে জড়ো হয়ে পড়ে থাকে।

কাজের মেয়েটাকে ঝাড়ুহাতে ঘরে ঢুকতে দেখলেই বিরক্ত ভাবে বলে, আঃ। এলি তো জ্বালাতে! দাঁড়া! এখন ঘর সাফ করতে হবে না! দেখছিস তো কাজ করছি! পরে করিস।

কাজের মেয়েটাও বেজার ভাবে বলে, আমার অন্য কাজ নাই? দাঁইড়ে থাকলে চলবে?

তমোনাশও সতেজে বলে, আচ্ছা আচ্ছা দাঁইড়ে থাকতে হবে না। যা পালা। আমি নিজে করে নেবো।

মেয়েটা অবশ্য দাঁড়িয়েই থাকে। উঠতেই হয় তমোনাশকে। অবশ্য এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব হতে পারে কেবল মাত্র বিদিশার অনুপস্থিতিতে! বিদিশার জ্ঞান গোচরে সংসারে এমন বেয়াড়া অনিয়ম আদিখ্যেতা চলতেই পারে না। তবে শিক্ষা বিভাগের ব্যাপার! ছুটি তো লেগেই আছে।

এমনিতেই তো শীত গ্রীষ্ম দুর্গোৎসব-জনিত আইনমাফিক লম্বা লম্বা ছুটি। তা ছাড়া—কর্মস্থলের নানাবিধ খুঁটিনাটি উপলক্ষ্য থাকে।

আর আছে যা রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা বিভাগেরই আছে। যখন তখন স্ট্রাইকের হাত ধরে চলে আসা ছুটি। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাঁটি থেকে চুনোপুঁটি বিদ্যাস্থান পর্যন্ত যার বিস্তার।

তার ওপর বোঝার ওপর শাকের আঁটি—বন্ধের ডাক। তা সে যে দলেরই হোক। মানসিক সমর্থন থাকুক না থাকুক। হামলা হাঙ্গামার ভয়ে বিদ্যামন্দির বা বিদ্যালয়গুলো তো স্বভাবতঃই বন্ধ পড়ে থেকে ঘরে ঘরে ছুটির হাওয়া বহায়।

কাজেই এখন তমোনাশের হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় মাসে কটা দিনই বা স্বস্তি! অর্থাৎ এই এখন।

কিন্তু মাত্র তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আগে! যখন তমোনাশ ব্যানার্জির—বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে আঙুলে গোনার মতো মাপাজোপা কটা দিন ছুটি থাকত।

রাজনৈতিক বন্ধের ডাকের দিনে, বন্ধের আগের রাত থেকে অফিসে গিয়ে পড়ে রাত্রিবাস করতে হত। গরমের দিনে হয়তো শুধু একটা বালিশ চাদর হাতে, আর শীতের দিন হলে কাঁথা কম্বল ঘাড়ে নিয়ে।

কিন্তু সেই 'ছুটি বিহীন' দিনগুলো কী দুঃখের স্মৃতি বহন করে আনে? কোথায়? বরং যেন একটা আলো ঝলমলে আনন্দের

স্মৃতিই মনের মধ্যে ঝিলিক্ দিয়ে ওঠে।

সে সব দিনে বিদিশা অবশ্যই তার অভ্যস্ত চাঁচাছোলা ধারালো ভাষায় তমোনাশের 'দাস মনোভাব' 'ক্রীতদাসত্বের ভূমিকা' ইত্যাদি নিয়ে তমোনাশকে একেবারে দীর্ণ বিদীর্ণ, হতমান্য করে ছাড়ত। মানে তাই চাইত।

কিন্তু তমোনাশ কী তা হত? সব বক্তব্য নীরবে হজম করে ভাবতে থাকত কতক্ষণে বাড়ি থেকে সরে পড়া যায়! রোজই সকাল থেকে সেটাই ছিল চিন্তা।

রাস্তা খারাপ, যানজট, যান-বাহনের দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি প্রভৃতি ছুতো করে কতটুকু আগে আগেই বা বেরোনো যায়?

বড় জোর আধঘণ্টা কী চল্লিশ মিনিট।

তার আগে ভাত চাইলে ভাতের বদলে মার খেতে হবে না! মানে খিঁচুনিটা কী মার-এর থেকে কম?

তা সত্যি বলতে—অস্বীকারও করতে পারে না তমোনাশ, তার মায়ের আমলেও চিত্রটি প্রায় একই ছিল। শুধু খিঁচুনির জায়গায় আক্ষেপ বাণী।

ভাত চাইলেই মা দালানের দেয়ালে ঝোলানো তস্যকেলে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠত, এক্ষুনি ভাত? এক্ষুনি তোর আপিসের বেলা হয়ে গেল? কটা বেজেছে বাবা? এখনো যে মাছটা কাঁচা পড়ে। কী দিয়ে ভাত দেব? কী বলছিস, মাছ চাই না? ও বেলা খাবি? সেটা তুই বললেই হবে? দরকার তো তোর নয়, দরকার তোর কাকার। তোর জন্যে হুড়োহুড়ি করে সাত সকালে বাজারে ছোটে।

অতএব সেই কাঁচা মাছ রান্না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়। সেটা করা যে কী দুঃসহ তা তমোনাশই জানে। অথবা ভুক্তভোগীরাই জানে।

'বেঁধে মারা অবস্থা' কথাটার অর্থ বোধগম্য হয় তখন।

এখন অবশ্য সেই ব্যাচিলার কাকাটিও নেই, আর মাও নেই। যিনি ভাত বেড়ে দিয়েই পাখা নিয়ে বাতাস করতে বসতেন। আর

ব্যগ্র ভাবে বলতেন, মাছের কাঁটাটা একটু বেছে দেব ? দিই না রে ? দোষ কী ? ছেলেবেলায় দিইনি, তাড়াহুড়ো করে যদি গলায় কাঁটা বেঁধে ?

বিদিশা তখন সবে নতুন বৌ। তবে চাকুরিরতাই। বিয়ে হচ্ছে বলে চাকরি ছাড়তে হবে এমন অনাছিষ্টি কথায় সে ঘাড় পাতেনি। সেও সকালটা ওই রান্নাঘরটার আশেপাশেই ঘুরঘুর করত বটে, অথচ তেমন আস্ত কোন কাজে হাত দিতে আসত না। তমোনাশের অফিস বেরিয়ে যাবার অপেক্ষা। সেও তো খেতে বসে যাবে। বেরোবার জন্যে তৈরি হবে।

তখন কিন্তু বিদিশা তমোনাশের এই সাত তাড়াতাড়ি ভাত খাওয়ায় তেমন বিরূপ হত না। তার পক্ষে তো সেটা সুবিধেরই। তখন তো—হেড্ মিস্ট্রেসের পদে ওঠেনি। কেবল মাত্র ইংরিজী দিদিমণী।

বরের ওই তাড়া দেওয়ার জন্যে হাসত না, বা বিরূপ হত না। শুধু ওই মাছের কাঁটা বেছে দেওয়ার প্রস্তাবে নীচু গলায় মন্তব্য ছাড়ত, আহা দিনই না। লজ্জা কী, চিরখোকা তো।

দুই

মা চলে গেছেন কবেই। প্রথম নাতনীটাকে মাত্র দেখে গেছেন। তারপর তো একে একে আরো দুই মেয়ে। এবং আরো একটি মেয়ে জন্মে ফেলেও, থাকেনি। আলোর মুখটি দেখতে না দেখতেই অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল। থাকলে পুরোপুরি গণ্ডা পুরত। মা সেটি কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন কে জানে।

তা তার সেই অকাল বিয়োগে যে এরা খুব বেশি মর্মাহত হয়েছিল, অথবা বেশিদিন সে শোক মনে পুষে রেখেছিল, এমন নয়। একটা সদ্যোজাত সন্তানের শোক কে কত মনে রাখে।

শুধু এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর মেয়েদের বিয়ের কথা-টথার

সময় বিদিশাকে একটু আপশোস করতে শোনা গেছে—সেইটাই হয়েছিল সবচেয়ে ফর্সা।

অন্য সবাই অবশ্য সে কথা মানে না। কারণ জ্যান্ত তিনটেও কম ফর্সা নয়। সকলেই বাপেরই রং পেয়েছে। তবে মাতৃহৃদয়ের আক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ বিরুদ্ধ কথা বলতে আসেনি।

তা একে একে তিনটে মেয়েই তো পার হয়ে গেছে। বলতে গেলে ঝপাঝপ। এবং দিব্যি ভালো পাত্রেই। বড় মেজ দুটোকে একটু দেখে শুনে দিতে হয়েছিল, ছোটটা নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছিল। আর তার বিয়েটাই বেশি দেখনদার। ব্যানার্জি থেকে বসাক হয়ে গেছে, বয়েই গেল। অমন কত হচ্ছে।

সেই ছোট মেয়ের গরবেই বিশেষ গরবিনী বিদিশা। তবে আর দুজনও তো ফ্যালনা নয়।

বড় থাকে বোম্বাই। মেজ বাঙ্গালোর। বিদিশা একবার করে ঘুরেও এসেছে মেয়েদের বাড়ি। এসে প্রশংসায় শতমুখ হয়েছে—মেয়েদের সংসারের জৌলুষ দেখে।

ছোট মেয়ে আছে ক্যানাডায়। সেখানেই এখনো ঘুরে আসা হয়নি। এলে কী বলবে কী করবে কে জানে।

নিজের সংসারের জৌলুষহীনতা কিছু দিন যাবৎ ম্রিয়মান করে রাখে বিদিশাকে, হতাশ হতাশ মনমরা। তবে আবার ঝেড়ে ফুঁড়ে ওঠে। সেই সংসারকেই চকচকে ঝকঝকে জৌলুষদার করতে—উঠে পড়ে লাগে।

তার জন্যে বিদিশা তমোনাশের তেমন পরোয়া করে না। ওর ওপর বিদিশার কোন প্রত্যাশাও নেই।

যতটা যা পারে নিজের অর্থ সামর্থ্যেই। সাহায্যকারী বলতে—ছোট ভাইটা। যে এখনো বেকার এবং আইবুড়ো।

সংসারের নতুন কী ছিরিছাঁদ ফিরছে, তা চোখেও পড়ে না তমোনাশের। নাড়া দিয়ে চোখে পড়িয়ে দিলে, বলে, আরে তাইতো এটা তো দেখিনি! বাঃ! বেশ সুন্দর! বেশ কাজেরও!

ব্যাস, ওই পর্যন্তই। তার নিজের চাহিদার মধ্যে একটু ফিটফাট হয়ে অফিস যাওয়া, আর 'হবি'র মধ্যে একটু আগে আগে (অর্থাৎ অফিস বসবার আগেই) অফিস যাবার চেষ্টা।

বিদিশা একদা মেয়েদের ডেকে ডেকে বলত, তোদের বাবা এত আগে আগে অফিস যেতে চায় কেন জানিস ? অফিস ঘরের কার্পেট ঝাড়তে।

এখন ভাইকে ডেকে ডেকে তমোনাশকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, তোদের জামাইবাবু এই সাত সকালেই অফিস ছুটছে কেন জানিস ? অফিস ঘরের চেয়ার টেবিল মুছতে।

যাক, সেসব বলাবলির পাট চুকে গেছে এখন। এই এগারো মাস বাইশ দিন হল। হিসেব করে দেখছিল তমোনাশ গতকালই। এগারো মাস বাইশ দিন তমোনাশ আর অফিস যায় না।

এখন শুধু বিদিশাই নিজস্ব নিয়মে বেলা দশটার মধ্যে খেয়ে নিয়ে সাড়ে দশটায় বেরিয়ে যায়। তমোনাশ যত বেলায় ইচ্ছে নাওয়া খাওয়া করে।

তবে সেই ইচ্ছের টাইমটির রিপোর্টটি ঠিকই পেয়ে যায় বিদিশা। ঝানু রিপোর্টার সোনালি মণ্ডল সারাদিনের সব ঘটনার রিপোর্ট তার মাসিমার কাছে অতি নিপুণ ভাবে পেশ করে। তমোনাশ খেতে বেলা করলে সে খবরটি তো নিজ স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বেশ ফলাও করেই করবে।

বিদিশাও তাই রোজ বেরোবার সময়ে বলে যায়, খেতে বেশি বেলা কোরো না। সময়ে নাওয়া খাওয়া করে নিও। প্রায় রুটিন মাফিক।

আজও বলে গেল। যাবার শেষ মুহূর্তে একবার কব্জিটা উল্টে তুলে ধরে ঘড়িটা দেখে নিল বিদিশা। ঠিক যে ভঙ্গিতে রোজ দেখে নেয়।

অতঃপর দ্রুত বেরিয়ে গেল প্যাসেজটা পার হয়ে। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেবার জোরালো দমাস শব্দটা শোনা গেল। যেমন রোজ যায়।

কপাটটা আস্তে চেপে দিলেও যে একই কাজ হয়, এ সত্যে বিশ্বাসী নয় বিদিশা। ওর ধারণা—ওই দমাস শব্দটার মধ্যেই নিশ্চিন্ততা নিহিত আছে।

শব্দটার ধাক্কাটা মাথার মধ্যে থেকে বিলীন হতেই সমস্ত পরিবেশটা যেন একটা অলৌকিক শব্দহীনতায় ডুবে গেল। আশ্চর্য নৈঃশব্দ।

সেই কাকভোর থেকে কাকের ডাকের শব্দ ছাপিয়ে একটানা এই ক কণ্টা যে কণ্ঠস্বরটি সারা বাড়িটায় ধ্বনিত হয়ে চলেছিল, সেটা থেমে যাওয়া মাত্রই মনে হল বাড়িখানা যেন হঠাৎ কোন ঘুমপাড়ানি মন্ত্রে মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

তমোনাশের নিজের কাটুম কুটুমের ঠুকঠাক শব্দটাও বিদিশার এই ঘরের মধ্যে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গিয়েছিল, (যেমন যায়) তা খেয়াল হল না।

একটু ক্ষণ চুপ করে যন্ত্রপাতি সরঞ্জামগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে থেকে, কী ভেবে সেগুলো নিয়ে আবার কাজ শুরু না করে আস্তে আস্তে কুড়িয়ে ছোট কাঠের বাক্সটার মধ্যে ভরে ফেলল তমোনাশ।

যন্ত্রপাতি! নামটাই ঘোরালো। তাদের দেখলেই তো বিদিশার হাসি পায়। একটা ছোট্ট হাতুড়ি, ছোট্ট বাটালি, মিনি সাইজের ন্যাংপেতে একটু করাত, একটা উখো, একটা স্ক্রু ড্রাইভার, একখানা হাতল ভাঙা কর্নিক, একটা নরুণ। এবং বলতে হাসি পায় রান্নাঘর থেকে পরিত্যক্ত ক্ষয়ে যাওয়া একখানা খুন্তি আর ক্ষুদে মাপের একটা সাঁড়াশি। এবং আরো এটা-ওটা টুকিটাকি।

তবে এই বাক্সটি তমোনাশের নিজের সংগ্রহ করা নয়।

এসব আবার কবে করেছে সে? কাটুম কুটুম কথাটাই কখনো শুনেছে কিনা সন্দেহ।

এ তার ব্যাচিলার কাকার নানান 'হবি'র মধ্যের একটি হবি। হোমিওপ্যাথি, গৃহচিকিৎসা, যোগ ব্যায়াম, মাছ ধরা, দাবা খেলা, পাড়ার কারো সঙ্গে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টা খানেক ধরে আড্ডা দেওয়া এত—সবের মধ্যও কোন এক সময় খাটের তলা থেকে টেনে বার

করতেন বাক্সটাকে। আর একমনে নিবিষ্ট হয়ে বসে ঠুকঠাক করে মজার মজার আকৃতির সব নানান্ জিনিস বানিয়ে ফেলতেন। একেবারে মাজা ঘসা সঠিক চেহারার নয়, তবু দেখলে মনে হবে ওটা হয়তো ঘাড় গোঁজা একটা বেড়াল, এটা হয়তো একটি আকাশ মুখো কুকুর, হয়তো বা ল্যাজ তোলা কাঠবেড়ালি। কিম্বা ইয়া পাগড়ি মাথায় মাথা বড় দেহ ছোট এক বুড়ো। বাড়িতে ছোট ছেলেপুলে বেড়াতে এলে, তাদের উপহার দিতেন ওদের থেকে। তমোনাশ তাকিয়েও দেখত না এসব ছেলেমানুষী!

আর এখন কিনা নিজেই সেই ছেলেমানুষী করে চলেছে। যার জন্যে বিদিশা মাঝে মাঝে মুখ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে বুড়ো বয়েসে ধেড়ে রোগ! বলে, বংশে ছিলেন তো এক পাগল, সেই হাওয়া আবার বইছে।

॥ তিন ॥

কী করে বইল, সেটাই এক আশ্চর্য।

কাকা থাকতে তো তাকিয়ে দেখেনি কখনো তমোনাশ। তিনি মারা যাবার কিছুদিন পরে হঠাৎ একটা রবিবারে কী ভেবে বাক্সটাকে খাটের তলা থেকে টেনে বের করে, ধুলো ঝেড়ে, ঘরের একদিকের দেয়াল জোড়া সাবেকি ঢাউশ ওই বাজে কাঠে তৈরি কাঠের আলমারিটার মধ্যে ভরে ফেলল। যার মধ্যে কাকার দাবার ছক; হোমিওপ্যাথি গৃহচিকিৎসা, নানাবিধ বই, পুরাণো পাঁজীর বস্তা।

কিন্তু সেই রাখাটা তো এমন কিছু না। কাকার স্মৃতির সেণ্টিমেণ্টে মমতা বশত হতেই পারে এ যত্নটুকু। যেটা অভাবনীয়, সেটা হচ্ছে নিজেই একদিন আলমারি খুলে বাক্সটা বার করে, বাক্সয় রক্ষিত কিছু শুকনো গাছের ডালপালা আর যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে বসে পড়া, কাকার মতো থেবড়ে মাটিতে।

আচ্ছা কবে ধরল এটা? বোধহয় সেই ভয়ঙ্কর দুঃখের দিনটার

কিছু দিন পরেই। ভয়ঙ্কর দুঃখের দীনটা কী যেন? কী আর, যেদিন নন্দন কানন থেকে নির্বাসন দণ্ড হল। তা নন্দন কাননই মনে হয় তাকে। বিদিশা যখন তার নাকের সামনে দিয়ে বাহারি শাড়ির আঁচল উড়িয়ে, বাহারি শ্রীনিকেতনী কাজের ঝোলাটার মধ্যে একশো জিনিস পুরে তার পেটটাকে ঢাউশ করে তুলে স্ট্র্যাপটাকে বাগিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে স্মার্ট ভাবে তরতরিয়ে এগিয়ে যায় তার নবনন্দন বিদ্যামন্দিরের উদ্দেশ্যে, তখন অজান্তেই একটা নিশ্বাস পড়ে তমোনাশের, নিজের সেই পঁয়ত্রিশ বছরের পরিচিত নন্দন কাননটির কথা স্মরণ করে।

নেহাৎই আইনগত কারণে তমোনাশকে—এই দীর্ঘ সময়টির মধ্যে বার দুই বদলি হতে হয়েছিল। তা সে বদলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কেঁদে ককিয়ে তদ্বির তদারকি করে, এঁকে ধরে ওঁকে ধরে আবার ঝটপট কলকাতায় ফিরে এসেছিল।

সংসার উঠিয়ে তো আর নিয়ে যায়নি। কী করে যাবে। এখানে বিদিশার চাকরির বন্ধন, মেয়েদের পড়া লেখার, গান শেখার, ছবি আঁকা শেখার অসংখ্য বন্ধন।

তমোনাশ একা গিয়েছে, যা হোক করে কাটিয়েছে এবং ফিরে এসেছে ঝাড়া হাত পায়ে। ফিরে এসে মনে হয়েছে, যেন হৃতরাজ্য ফিরে পেল।

সেই স্বর্গের প্রবেশপত্র আর নেই তমোনাশের! কী খেয়ালে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল, গিয়ে নিজেকে যেন বোকা বোকা আর হ্যাংলা হ্যাংলা মনে হল। মনে হল যেন সবাই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। অথচ বহির্দৃশ্যে মোটেই তেমন নয়। এই ক মাসের মধ্যে তো আর সবকিছু বদলে যায়নি। যেখানে যা ছিল তাই আছে। সহকর্মীরাও সকলেই আছে। আগ্রহ করে বসানো, কথা বলানো, চা আনিয়ে খাওয়ানো, তবু তমোনাশের মনে হল, যাক এই শেষ আর না! এটা একটা সৌজন্যদর্শন মতো করে যাওয়া হল।

তবে তমোনাশের ভাগ্যে সেদিন তার বস হালদার সাহেব

অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি আজ আসেননি শুনেই হঠাৎ যেমন হতাশা এলো, তখুনি আবার যেন একটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচার নিশ্চিন্ততা এলো।

তা সত্যিই সেই শেষ। আর ওই অফিসপাড়া মুখো হতে ইচ্ছে হয়নি। অথচ যাবার আগে কী উত্তেজনা অনুভব করেছিল। ঘুরে আসার পর কেমন যেন মিইয়ে গেল ভাবটা। নিজেকে মনে হল অনধিকারীর ভূমিকায়। বিদিশা যখন হেসে হেসে বলল, কী গো, পুরনো বন্ধুরা কী বলল?

তমোনাশ অগ্রাহ্য ভরে উত্তর দিল, বলবে আবার কী? ফেয়ার-ওয়েলের দিন নাম-কা—ওয়াস্তে সবাই মিলে খুব বলেছিল, ব্যানার্জিদা, আসবেন মাঝে মাঝে! আমিও সেই রকম নাম-কা—ওয়াস্তে বলেছিলাম আসতেই হবে। তোমাদের না দেখে কী থাকতে পারব? তাই গেলাম একদিন কথা রক্ষা করতে। ব্যাস।

হ্যাঁ, তার পরদিনই বোধ হয় তমোনাশ বিদিশা যখন স্কুলে, আলমারি খুলে বাক্সটাকে বের করে, আবার ধুলো ঝেড়ে মাটিতে নামিয়ে খুলে বসেছিল।

প্রথম প্রথম ওই দুপুর বেলাটাতেই চেষ্টা চলেছিল, কাকার মতো পারে কিনা দেখতে। এখন আবার দুপুরে আর এক বুড়ো বয়সে বেড়ে রোগ ধরিয়ে বসেছে। যেটা একেবারে বিদিশার অলক্ষ্যে অগোচরে রাখতে হবে।

অতএব সকালের এই সময়টায় ওই ঠুকঠাক। কী করবে এত বড় সকালটা নিয়ে? আচ্ছা অফিসে তো যেত নটা কী বড় জোর পৌনে নটায়। তার আগে তো নয়। কিন্তু ছটা থেকে নটা—এই তিনটে ঘণ্টা কোথা দিয়ে হুশ করে চলে যেত চোখে দেখতে পাওয়া যেত না। তবুও তখন ভুলেও বাজারমুখো হত না।

বাজারটা কে জানে কাকে দিয়ে অথবা নিজেই ম্যানেজ করে নিত বিদিশা।

তমোনাশের রিটায়ারমেন্টের পর বিদিশা জবরদস্তি বাজার করা

ধরিয়েছে তাকে। ক্রমশ দেখছে খুব খারাপ লাগছে না। একটু বেশি বেশি টাকা নিয়ে যেতে পারলে ভালোই লাগে।

তবু বাকি সময়টা? সকালটা এত বড়?

তা ছাড়া এই ছেলেমানুষী খেলাটা নিয়ে বসলে, ভোর থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত বিদিশা যে মেল ট্রেন চালিয়ে যায় তার ধাক্কা থেকে একটু রেহাই মেলে।

আসলে চুপচাপ কোন কাজ করতে পারে না বিদিশা। কোন কিছু একটা নিয়ে অভিযোগে মুখর সোচ্চার হতে না পারলে, যেন গায়ে জোর আসে না তার।

বাক্যহটার প্রধান টার্গেট অবশ্য বিদিশার ভাষায় 'অকর্মার ধাড়ি' ওই কাজের মেয়েটা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোন এক গ্রাম থেকে এসে পড়া সোনালি মণ্ডল। তার বিরুদ্ধেই বিদিশার যত অভিযোগ আক্রমণ তর্জন গর্জন।

অথচ তমোনাশ তো দেখে মেয়েটা সংসারের সব কাজ করছে। তমোনাশের মায়ের আমলের বাসন মাজুনি বুড়ি গীতার মা এবাড়ি ছাড়তে চায় না বলেই বাসন মাজার কাজটা করে। বাকি সবই সোনালি।

তমোনাশ ভেবে দেখতে চেষ্টা করে, তার মা'র আমলে 'বাকি সব'টা কে করত? ঠিক বুঝতে পারে না। তবে মনে হয় বাড়ির ভেতরকার কাজগুলো মা করতেন বাইরেরগুলো কাকা।

তবু বাইরের কাজই কী তখন এত ছিল?

দুধের ডিপোয় যেতে হত কী? গোয়ালা এসে দুধ দিত। ধোপা আসত কাপড় নিতে দিতে...., র‍্যাশন নামক ব্যাপারটা চালু থাকলেও তাদের এই হাতিবাগানের পাড়ায় মুদির দোকান থেকে মাসকাবারি-টা সবই সংগ্রহ করা যেত।

কিন্তু এখন? কেরোসিনে লাইন দেওয়া, দুধ আনা, লণ্ড্রীতে ময়লা কাপড় দিতে যাওয়া এবং যথা সময়ে নিয়ে আসা, বাজার দোকান, পাম্প চালানো বন্ধ করা, আর হরদম ফাই ফরমাস। তাছাড়া রান্না-

ঘরের সর্ববিধই তো।

আগে মাকে কুটনো কুটতে দেখত, মাঝে মাঝে বিদিশাকেও। মাছ কুটতে দেখত কাকাকে। বাজারটা এনে নামিয়েই তিনি দালানের কোণে নর্দমার দিকটায় বসে পড়তেন মাছ কোটা বঁটিটা নিয়ে। এ তাঁর বিশেষ শখ ছিল। রান্নার গ্যাস অনেক লোকের বাড়ি চালু হয়ে গেলেও তমোনাশদের বাড়িতে তেমন হয়নি। সেটা এলেও দুধ জ্বাল দেওয়া, খাবার করা গোছের শৌখিন কাজগুলোই করা হত তাতে। রান্নাঘরের জন্যে যথারীতি ছোট বড় মাঝারি কতকগুলো বালতি উনুন থাকত। যেগুলো ধরাতে কয়লা ভাঙতে হত, কাঠ টুকরো করতে হত। তাদের থেকেও কাকা অনেক সময় তার কাটুম কুটুমের মাল সংগ্রহ করতেন।

লন্ড্রীতে দেওয়া হত খুব দামী শৌখিন কাপড়-চোপড়। অথবা কাচানোর নেহাত জরুরি দরকার পড়লে আর্জেন্ট হিসেবে দিয়ে আসা নিয়ে আসা হত। এখনকার মত ধোপাবিহীন অবস্থা ছিল না। এখন যাবতীয়ই লন্ড্রীতে চালান করা হয়।

কেরোসিনের টিন কিনে রাখা হত। তবে বাড়িতে বিদ্যুৎ আসার পর আর কেরোসিনের কী কাজ? পাম্প স্টোভটা ধরাতে। তমোনাশের নেহাৎ শৈশবে জনতা স্টোভ দেখেছে কিনা মনে পড়ে না। তবে পরে দেখেছে। তার জন্যে বোধহয় কেরোসিন লাগত। সে তো কেরোসিন-ওয়ালা বাড়ি বাড়ি ফেরি করে বেড়াত। একটা পাঁইট বোতল থাকত তার সঙ্গে, গলায় দড়ি বেঁধে টিনের আংটায় ঝোলানো।

এ বাড়ির দরজায় এসে হাঁক পাড়ত—কেরোসিন, কারণ তমোনাশের কাকা অবিনাশের সঙ্গে সকলের খাতির।

কাকা কী কেরোসিনে লাইন দেওয়া দেখে গেছেন? তমোনাশ জানে না। নিজে তো সে কখনো ও সব দেখেনি। পাঠ্যাবস্থায় স্কুল কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, পাড়ার ক্যারাম কমপিটিশান, লাইব্রেরী—এইসব নিয়ে কাটিয়েছে। তারপরই তো মোক্ষ লাভ। জুটে গিয়েছিল নন্দন কাননে ঢুকে পড়বার ছাড়পত্র।

অতঃপর বিয়ে।

দিনগুলো যে কোথা দিয়ে চলে যেত, সংসারের কাজ-কর্ম কী ভাবে চলত জানতই না। মাঝে মাঝে র‍্যাশন, র‍্যাশনের চালের কাঁকর—এ সব শুনতে পেত বটে, তবে সে চাল তারা খেত না।

এই হাতিবাগান বাজার থেকেই ভালো চাল কী ভাবে নগদে কিনে স্টক করতেন কাকা তাও তেমন ভালো করে শুনত না।

ওই কাকার সঙ্গে যে সকলের খাতির। কাকা বলতেন, রাম কহো, রেশনের চাল আবার ভদ্দরলোকে খেতে পারে ?....গুলজারির দোকান থেকে নিলাম।

আবার মাকে ডেকে চুপি চুপি বলতেন, কারুর কাছে যেন গল্প করতে বোসো না বৌদি। ব্যাপারটা সিক্রেট। গুলজারি বিপদে পড়ে যাবে।

ওই গুলজারির দোকান থেকেই তমোনাশদের মাসকাবারি সব মাল আসত। সারা মাস ধারে ও জোগান দিত। একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিলেই হল কী চাই লিখে। সেটা ওই বাসন মাজুনিই যাতায়াতের কালে দিয়ে দিত।

তমোনাশের মায়ের হাতের লেখা সেই চিরকুট দেখে কাকা মাসের শেষে শোধ দিয়ে দিতেন, মাকে কখনো আঙুল তুলে কোন অভিযোগ করতে দেখেনি তমোনাশ।

কিন্তু এ রকম সুবিধে সবাই পেত না। বাঁড়ুয্যে বাবুদের বাড়ির কথা স্বতন্ত্র। বাঁড়ুয্যেরা তো বলতে গেলে এই বাজারের জন্মকাল থেকে খদ্দের।

ঠাকুর্দার কাছে ছেলেবেলায় শোনা গল্পে জানা ছিল। তমোনাশের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা, না কি তাঁর বাবা নদে জেলার কোন্ গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে এসে ওই হাতিবাগান অঞ্চলে ধুলোমাটির দরে খানিকটা জমি কিনে ফেলে বসত স্থাপন করেছিলেন।

হাতিবাগান টোলে ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। তো সে সব তো

ঐতিহাসিক গল্পকথার মতো।

তমোনাশের শৈশব স্মৃতিতে যা ধরা আছে, সেটা তমোনাশের ওই কাকার যুগ। সে যুগে তমোনাশের কোন দায়িত্ব ছিল না।

একটা দায় ছিল বটে, মাঝে মাঝে তাঁর বাপ কাকার পূর্বপুরুষদের চরিতকথা শোনা।....সেটা তমোনাশের সত্যিই দায় মনে হত। তবে কাকাকে তো অসম্মান করতে পারে না। তাই মন দিয়ে শোনার ভান করতেই হত।

আশ্চর্য, সেই ভান থেকেই কত কিছুই মনে থেকে গেছে, মনে গেঁথে আছে। আর গেঁথে আছে ঠাকুর্দার চেহারাটি।

বাবাকে মনে পড়ে না। পড়বার কথাও নয়। সেটা দুগ্ধপোষ্য অবস্থার সময়ের ব্যাপার। কিন্তু সেই ঠাকুর্দার কথা বলতে বসলেই তমোনাশের মেয়েরা কী অনায়াসেই বলত, থাক বাবা, তোমার ঠাকুর্দার কথা বলতে বসতে হবে না। ছোট দাদুর কাছে শুনে শুনে কান পচে গেছে।

॥ চার ॥

হ্যাঁ, কাকাকে তার বড় মেয়ে মেজ মেয়ে ভালভাবে দেখেছে। ছোট মেয়ে অতি শৈশবে। মা চলে গেলে কাকা একাধারে বাড়ির হেড এবং গিন্নীর ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

শেষ দিন পর্যন্ত দুধ দুয়ে দিতে আসা গোয়ালাটাকে সার্চ করেছেন। বালতির কোন অদৃশ্য চেম্বারে জল ভরে এনেছে কিনা। সেইদিনই টুক করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর বোঁদির মতোই। মা তো দু দশটা দিনও ভোগেননি। তবে কাকা বড় অকস্মাৎ। কাকা চলে যাওয়ার পরই হঠাৎ যেন সব বদলে গেল। তখনকার সংসারের চেহারায় আসমান জমিন ফারাক এখনকার সংসারের।

এখন? খুব নিরীক্ষণ করে না দেখলেও ভাসা ভাসা ভাবে

সবই দেখছে এই একটা বছর তমোনাশ। না দেখে উপায় নেই বলেই।

দিনের মধ্যে অন্তত আট নয় দশ ঘন্টা সময় পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার উপায় তো নেই আর এখন।

তমোনাশের নিজস্ব জীবন শুধু বিদিশার অনুপস্থিতির ঘণ্টাগুলো। দশটায় বেরোয় বিদিশা, সাড়ে পাঁচটা ছটা নাগাদ ফেরে।

স্কুলটা দূরে নয়, বিদিশার বাপের বাড়ির পাড়ায় টালা পার্কে। আইবুড়ো বেলা থেকে ওখানেই পড়াত। সামান্য কিছু মেয়ে নিয়ে গড়ে ওঠা ওই নবনন্দন। একনাগাড়ে তিরিশ বছর সেখানেই। আর সেই সদ্য মাথা তোলা চারাগাছটি এখন মহীরুহ। ছাত্রী সংখ্যা অবিশ্বাস্য। এইটি বিদিশার সামনেই হয়ে উঠেছে। বিদিশাও যেন তার একটা অংশ।

তা তমোনাশদের এই হাতিবাগান বাজারের কাছাকাছি বাড়িটা থেকে স্কুলটা এমন কিছু দূর নয়। কাজেই যাতায়াতের খাতে অনেক সময় লাগে না। যেমন লাগত তমোনাশের ডালহৌসি থেকে।

বেলা দশটা থেকে ওই বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত তমোনাশের চোখ কান নিজস্ব ভাবে কাজ করতে পায়। আর সেই পাওয়া থেকেই তমোনাশ অনুভব করে সোনালি নামের ওই ক্ষুদে অথচ দুঁদে মেয়েটাই এ সংসারের কর্ণধার। যাকে বলে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব তার ঘাড়ে। ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তার ছুটি নেই। হাত পা চলেই চলেছে।

তবু বিদিশা যতক্ষণ বাড়ি থাকে, তার অজস্র খুঁৎ দেখতে পায়। অতএব নামকরণ অকর্মার ধাড়ি।

আশ্চর্য! তবু মেয়েটা রিপোর্টার হিসেবে তার মাসিমার একেবারে বশংবদ। নিজে থেকেই জানায়। অথচ তমোনাশের যদি কখনো (মানে এই বেকারত্ব ঘটার পর) সংসারের কোন খবর জানতে ইচ্ছে করে, জানতে চায় জিজ্ঞেস করে করে। তাও, যন জবাব দেয় ঠ্যালামারা দায়সারা ভাবে।

কী এটা? স্বজাতি প্রেম? না স্বজাতি ভীতি? তবু

তমোনাশেরই মেয়েটার ওপর মায়া আসে।

বিদিশা বেরিয়ে পড়বার পরেই ওই যে স্তব্ধতাটি নেমে এল, তমোনাশ যেন তারই একাংশের মতো কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আশ্চর্য, কাকও ডাকছে না যেন এখন কোথাও। আর কাজের মেয়েটা, সেও বোধ হয় লম্বা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তার ব্রেকফাস্টটি নিয়ে বসল। সকাল থেকে শুধু এক গেলাশ চা ছাড়া আর কিছু খাবার সময় মেলে না।

বিদিশাকে অবশ্য তাড়া দিতে শুনতে পাওয়া যায় এক একবার, অ্যাই সোনালি! খাবারটা খেয়ে নে না। আর চা থাকে চা-দানীতে, তো গরম করে নে।

সে নির্দেশ মানতে দেখা যায় না। শুনতে পাওয়া যায়, অ্যাকবার তো খেইচি। এত তাড়া কী? হাত খালি হলে ধীরে সুস্থে খাব অখন।

তাতেও কটকটিয়ে বলে ওঠে বিদিশা, ওঃ! এত কাজের চাপ তোর যে সময়ে দুপিস পাঁউরুটি কী দুখানা রুটি খেয়ে নেবার সময় হয় না? অন্য বাড়ি হলে দেখতিস।

কথা। কথা। কথার মালা। খুব মজবুত সুতোয় গাঁথা, সহজে ছিঁড়ে পড়ে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তমোনাশ আর কাজে হাত না দিয়ে ছড়ানো সরঞ্জামগুলো কুড়িয়ে বাক্সজাত করে ফেলে বাক্সটাকে আলমারির মাথায় তুলে ফেলল।

মাদুরখানাকে যেমন তেমন করে গুটিয়ে ফেলে দেয়ালের একটা কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে দোতলায় উঠে গেল।

॥ পাঁচ ॥

বাড়িখানা যেকালে গড়া হয়েছিল সেকালে খুবই ছোট বলে গণ্য হয়েছিল। ওপর নিচেয় মাত্র তিনখানা তিনখানা ছখানা ঘর। তবে

মাপে নেহাৎ ছোট নয় ঘরগুলো। অর্থাৎ দশ বাই বারো বা বারো বাই বারো নয়। আড়ে দীঘে তার দেড়া। কী দুগুণ।

কাজেই এযুগে এ বাড়িকে বিরাটই বলা হবে! তবে আগে জায়গায় কুলোত না, এখন শূন্য ফাঁকা। তো দোতলাটা বিদিশা সাজিয়েছে দিব্যি চমৎকার। আধুনিক বাথরুম বানিয়েছে একখানা। শাওয়ার বাথটাব ইত্যাদি যা যা আধুনিক জীবনযাত্রার অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে তমোনাশ সময় অসময় সাবেকি নিচের তলার বাথরুমটা ব্যবহার করে বসে। আর বিদিশার কাছে ধিক্কার খায়।

বিদিশা ভেবে পায় না, শাওয়ার খুলে নাওয়ায় থেকে চৌবাচ্চা থেকে বালতি বালতি জল তুলে মাথায় ঢালতে কী করে বেশি আরাম হয় মানুষের।

চৌবাচ্চাটা ভাঙতে চেয়েছিল বিদিশা, সেই জায়গাটায় পাম্প বসাবে বলে তমোনাশ শুধু ওইটিতে একটু আপত্তি জানিয়েছিল! বলেছিল, পাম্প তো কখন চালু কখন অচালু। জলের স্টক একটু থাকা ভালো।

বিদিশা ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হেসে বলেছিল, তোমায় মানুষ করে তোলা এই বিদিশা ব্যানার্জির কর্ম নয়। কবে কোন্ দিন দরকার পড়তে পারে বলে রোজ একটা বাড়তি কাজ। চোবাচ্চা ছাড়ো ভরো —বাবাঃ।

বাধ্য হয়ে বাথরুমের বাইরের সরু রোয়াকটার ওপর পাম্পের ঘর বানানো হয়েছে।....এটা না হলে তো দোতলায় জল উঠবে না। এ কী আর তমোনাশের শৈশবকাল যে দোতলাতেও মোটা ধারায় জল উঠছে।

যদিও তখন দোতলায় স্নানের ঘর ছিল না, তবে কোণের দিকের ঘরের পাশে একচিল্‌তে ছোট্ট ছাতে তমোনাশের মায়ের যে টবের বাগান ছিল সেই বাগানের পরিচর্যা করতে, সেখানে একটা ট্যাপ বসিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাতে একটা সুবিধে ছিল দোতলার জলের কুঁজোগুলোকে আর নিচে নিয়ে গিয়ে ভরে আনতে হত না।

আশ্চর্য ! সারাজীবন অন্যমনস্ক থেকে এসেও এখন কী করে যে তমোনাশের কেবলই চোখের সামনে সাবেকি সংস্কারের ছবিটা ভেসে ভেসে ওঠে। আর মনটা কেমন করে।

একেই কী বলে নস্টালজিয়া ? আচ্ছা, মেয়েরা কী কখনো নস্টালজিয়ায় ভোগে ?

দোতলাটা রীতিমত সাজানো গোছানো।

তমোনাশ উঠে এসে সবকিছু একবার অবলোকন করে মেয়েদের পড়ার ঘর নামের যে ছোট্ট ঘরখানা ছিল তার মধ্যে ঢুকে এলো। পড়ার টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে টেনে বার করল একগোছা ফুলস্ক্যাপ কাগজ আর একখানা বাঁধানো খাতা।

এই হচ্ছে তমোনাসের বুড়ো বয়েসের ধেড়ে রোগ।

তমোনাশ মাস কয়েক থেকে লেখার চর্চা শুরু করেছে। কিন্তু কী লিখছে ? গল্প ? উপন্যাস ? প্রবন্ধ ? কবিতা ? নাঃ। সে সব কিছু না। তমোনাশ লিখতে চেষ্টা করছে স্মৃতিকথা। যে স্মৃতিগুলো মাঝে মাঝেই মনের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে, অথবা একটা মন কেমন মন কেমন ভাবে বিষণ্ণতার ছায়া ফেলে, সেগুলোকে লিখে খাতার পাতায় ধরে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে তমোনাশের, কিছু দিন থেকেই।

মুখের কথায় স্মৃতিচারণ করবে এমন সুযোগ কোথায় ? শুনবে কে ? কার এত সময় আছে ? রুচিই বা আছে কার ? জ্ঞান থেকে যা দেখেছে আর যাদের দেখেছে সে সব লিখে রাখতে ইচ্ছেটা যেন ঠ্যালা মারছে তমোনাশকে কেবলই।

কী সব উজ্জ্বল আলোকময় চরিত্রদের দেখেছে তমোনাশ তার শৈশব থেকে।.....এখন আর তেমন দেখতে পায় না। তমোনাশের শৈশবকালে দেখা সব চরিত্রই যেন উজ্জ্বল বর্ণময়। তাই সে ঠিক করেছে পর্যায়ে পর্যায়ে সকললের কথাই লিখবে। প্রথমে পরিবার পরিজনদের, যা সমস্ত শৈশবকালটা ভরে আছে। পরবর্তী কালে

স্কুল জীবনের স্যারদের কথা লিখবে। ক্রমশ-কলেজ জীবনের সহপাঠীদের। এবং অতঃপর কর্মজীবনের সহকর্মী আর ওপর-ওয়ালাদের। এইভাবে ভাগে ভাগে লিখলে সুবিধে হবে। এটাই তার ধারণা।

সবটাই কী উজ্জ্বল? কোথাও কী এক আধটু কালির ছিটে নেই? হয়তো আছে। থাকতেই পারে। কিন্তু জাগতিক নিয়মে 'স্মৃতি সততই সুখের।' অতীতটা কেমন করে যেন তার কালোটা ঝাপসা করে ফেলে, আর আলোটাকে প্রদীপ্ত করে তোলে।

কালের প্রবাহে এবড়ো খেবড়ো রুক্ষতাটা মসৃণ হয়ে যায় মনে হয়, তখন কেমন ছিলাম! তখন জীবনে আনন্দ ছিল, আহ্লাদ ছিল, আর যেন একটা ধ্রুব লক্ষ্য ছিল।

কী সেই লক্ষ্য? আসলে হয়তো কিছুই নয়। হয়তো শুধু দৈনন্দিনের ঋণ শোধ করেই চলা হয়েছে। তবু মনে হয় তখন অনেক ছিল।

বহির্জীবনে যারা অনেক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে, হয়তো সমকালেদের ঈর্ষাভাজন হয়েছে, তারাও তাদের ঝকঝকে চকচকে জীবনের খোলসের মধ্যে থেকেও নিশ্বাস ফেলে ভাবে, আগে কী শান্তিতেই ছিলাম। আগে যেন জীবন বলে একটা জিনিস ছিল। এখন আর সেটাকে খুঁজে পাই না।

এই হচ্ছে মনের স্বভাব। ভেবে দেখলে আসলে তখন আমার আমল ছিল। এটাই ছিল সুখ। ওই আমলটাই জীবন। বয়েস হয়ে গেলেই কোন্ ফাঁক দিয়ে ফস্ করে হাতছাড়া হয়ে যায় সেই আমলটা। অর্থাৎ তখন যত গৌরবান্বিত জীবনই হোক ভিতরে ভিতরে জমে ওঠে একটা গভীর শূন্যতা। মনে হয় পৃথিবী যেন আর আমার নেই। সে তাই আর আমায় আমল দিচ্ছে না। সে অনুচ্চারে বলে চলেছে 'তোমার কালটি ফুরিয়েছে হে! তোমার আর সরব হওয়া মানায় না।'

তমোনাশের মনের মধ্যে হঠাৎ সেই শূন্যতার ব্যথা।

তবু সে ভেবে দেখতে চেষ্টা করে, আগে-বিগত কালেও কী এমন ছিল ? নিয়ম ছিল ? আমল ভিত্তিক ?

তা থাকলে তখন বয়স্করা, কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়া কর্তারা, অমন দাপটের সঙ্গে থাকতেন কী করে ? কী করে ভাবতেন আমার এই সংসারের সব কিছুই আমার। আমিই সকলের কর্তা, প্রভু, আমার নির্দেশেই চলবে সংসারের চাকা।

চলতও তো তাই।

কর্তারা ইচ্ছেতেই তো কর্ম হত। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরাম আয়েস করবারও অধিকারী। তাঁদের ব্যাপারে কোন সমালোচনা ওঠার কোন প্রশ্নই নেই। ভাবটা যেন-তারা সারা জীবন খেটেপিটে চাষ করে ফসল ফলিয়েছেন, এখন তাঁদের ফসল তোলার দিন।

সেই বিগত কালটি তো মেনেও নিত সেটি।

সমগ্র পরিবার পরিজনও তো ভাবত এটা ওঁর প্রাপ্য এই সমীহ সম্ভ্রম মান্যতা।

কিন্তু এখন ? তমোনাশ নামের মানুষটা, এই সেদিনও যে সরকারি অফিসের একটি পদস্থ কর্মচারী ছিল। তার অধীনে বেশ কিছু এম এ, বি এ. পাশ ছেলে ছিল। তারা আড়ালে যে মনোভাবেরই থাকুক, সামনে ব্যানার্জি সাহেবকে তোয়াজ করত। সেই তমোনাশ এখন জানে, এ সংসারে সে কেউ নয়। কিছু নয়। কিছুই তার নয়।

কী করে যে হঠাৎ এমন পালাবদল ঘটে গেল। কোন্ ফাঁকে। না কি তমোনাশেরই অক্ষমতায় বা অসতর্কতায় ? যে জন্যেই হোক তমোনাশ জানছে, সে কেউ নয়। মাথার মধ্যে এই শূন্যতাটাই যেন পর্বতের ভার নিয়ে বসে থাকে।....সেই ভার নামাবার বাসনাতেই তমোনাশের এই স্মৃতিকথা লেখার প্রেরণা ?

কিন্তু লিখবে তো। তবে শুরুটা করবে কী করে ?....শুরুটাই বড় শক্ত। দু পাঁচ লাইন লেখে আর কাটাকুটি করে, তারপর ছিঁড়েই ফেলে।

এই জন্যেই খাতা এবং খুচরো কাগজ-দুটো উপকরণ। ঠিক করেছে আগে ওই খুচরো কাগজগুলোয় জিনিসটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলে

তারপর খাতায় তুলবে।....

এই প্রাথমিক পর্যায়টা কিছুতেই বিদিশার সামনে নয়। তমোনাশের যা কিছু অ্যাকটিভিটি তা দেখলেই যেন বিদিশার হাড় জ্বলে যায়। ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটা ব্যঙ্গের আভাষ ফুটে ওঠে।....যখন অফিস যেত—যাবার প্রস্তুতিতে একটু তাড়াহুড়ো দেখলেও এমন হত, অফিসে তার কতটা মহিমা, তেমন একটু গল্প করতে গেলেও হত, আবার এখন কাটুম কুটুম নিয়ে বসলেও হয়।

তবে লেখক হতে বসা দেখলে, সেই ঠোঁটের কোণ্‌টি কী পরিমাণ বঙ্কিম হয়ে উঠবে ভেবেই গায়ে কাঁটা দেয়।

অতএব এই সময়টুকু। যখন বিদিশা বাড়ি নেই॥

॥ ছয় ॥

আজ তমোনাশ তার লেখার একটা নামকরণ করবে ঠিক করে খাতাখানা হাতে নিল।

কী নাম দেবে? অন্তত প্রথম অধ্যায়টার॥ শৈশব স্মৃতি? যাদের দেখেছি? জীবনের অভিজ্ঞতা? অতীতের দিন আর বর্তমান?

কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না। মানে বেশ জুৎসই লাগছে না। তা হলে? বেশি কাব্যিক হবার দরকার নেই। তবে, একটু বিশেষত্ব পূর্ণ তো হতে হবে।

আচ্ছা-জীবনের পথে পথে—

আচ্ছন্ন চিত্তের ওপর ধাঁই করে একটা পাথরের টুকরো এসে পড়ল।

মেসোমশাই—

সোনালি! দোতলায় উঠে এসেছে।

আজ আর নাওয়া খাওয়া করবেননি?

চমকে ঘড়ির দিকে তাকাল তমোনাশ। কী সর্বনাশ। একটা বেজে গেছে! দেড়টা বাজে। কোন্ ফাঁক দিয়ে এতটা সময় পার

হয়ে গেল ? অথচ লেখা বলতে তো কিছুই হয়নি। শুধু কিছুটা কাটাকুটি আর নাম নির্বাচিন।

তাড়াতাড়ি খাতাপত্র ঢাকা দিয়ে বলে ওঠে, ইস, এতটা বেলা হয়ে গেছে ? একটা দরকারি কাজ করতে করতে—এক কাজ কর, আমার ভাতটা গুছিয়ে টেবিলে ঠিক করে রেখে, তুই খেয়ে নিগে। আমি চানটা সেরে নিয়েই—

সোনালি কপালের রুখু রুখু চুল কটা সরিয়ে বলে, আপনার ভাত ঢেকে রেখে আমি খেয়ে নেব ? কী যে কন !

তমোনাশ ব্যস্তভাবে টেবিলটা গোছাতে গোছাতে বলে, তাতে কী ? আমার হয়ে উঠতে তোর তো খিদে পেয়ে যাবে। ছেলেমানুষ।

ফ্রক পরা মেয়েটা। আঁচল নেই ! মুখটা একটু ফিরিয়ে ঘাড়ে ঘষে নিয়ে বলে, আপনার আগে খেয়ে নিয়েছি শুনলে মাসিমা আমায় আস্ত রাখবে ? আমার অত খিদে পায় নাই।

তমোনাশ আরো ব্যস্ত ভাবে চানের ঘরে যেতে যেতে বলে, কী মুশকিল। একটু আগে ডাকিসনি কেন ? ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি ?

মেয়েটা হঠাৎ একটু ফিক করে হেসে ফেলে বলে, কাজ সারা হতে, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস হচ্ছিল—

অর্থাৎ ঘুমিয়েই ছিল।

তবে ঠাণ্ডা বাতাস ! তমোনাশ মনে মনে একটু হাসে। আসলে নিচের তলার ঘরের অবাধ স্বাধীনতায় নির্ঘাৎ পাখাটি ফুল ফোর্সে খুলে দিয়ে—

কিন্তু সত্যি বলতে তমোনাশ এ সন্দেহে বিদিশার মতো ক্ষেপে তো ওঠেই না, বলতে কী তেমন কিছু অপরাধও দেখে না।

হাতের কাছে উপভোগের উপকরণ ছড়ানো। হাত বাড়িয়ে একটু না ছুঁয়ে পারে, এত সংযম কার আছে আশা করা যায় ?

যারা ভোগ সমুদ্রে ভাসছে, তারাও আরোর জন্যে দুর্নীতির পাঁকে ডুবছে। আর এই একটা ছোট প্রাণী, আর তুচ্ছ একটু অপরাধ।

সর্বদা ভোগ করতে হাত বাড়ায় না, সেটা শুধু ভয়ে। কিন্তু তমোনাশ? মেয়েটা দৈবাৎ একটু পাখা খুলে বসলে, বিদিশা যখন তর্জন গর্জন করে, তমোনাশ তো বলে উঠতে পারে না, আহা, সারাক্ষণ খাটছে। ছেলেমানুষ। আমরা তো সর্বদাই খাচ্ছি।

ও বাবা! এত সাহস হবে? ভয় জিনিসটা কী ভয়ংকর। সে শুধু অন্যায় করা থেকেই নিবৃত্ত করায় তা নয়, অন্যায় থেকেও নিবৃত্ত করায়।

মেয়েটার সম্পর্কে দৈবাৎ কোন সময় ছেলেমানুষ শব্দটি উচ্চারণ করে বসলে রক্ষে আছে? তমোনাশের আস্কারাতেই যে ও এত বেয়াদব বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। এ কথা বুঝিয়ে ছাড়বে না বিদিশা?

তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে নেয় তমোনাশ। নিত্যকার মতো একবার বলে, তোর আছে তো কিছু? না সব মেসোমশায়ের পাতে চাপিয়েছিস?

মেয়েটা কৃতার্থমন্যের হাসি হেসে বলে, তা আর না? সোনালি এত বোকা?

কিন্তু এমন সহজ ভাবে কথা বিদিশার সামনে বলা যায় না কেন? বাবা! ভাবতে গেলেই অসম্ভব মনে হয়। অথচ ওরাও তো মানুষ। আর ছেলেমানুষ! কোন্ দূর গ্রাম থেকে শুরু রুজি-রোজগারের আশায় এসে পড়ে আছে মা-বাপ ভাই-বোন সঙ্গী-সাথী ছেড়ে। ঘুণাক্ষরে এ ধরণের কথা মুখে আনো দিকি! স্কুল টিচার বিদিশা ব্যানার্জী বার্স্ট করে বসবেন। যদিও ক্লাসে ছাত্রীদের মানবিকতা সম্পর্কে 'এসে' লিখতে দেন তিনি। সাক্ষরতা আন্দোলনের একজন পাণ্ডা।

খেয়ে এসে আবার লেখাটা নিয়ে বসল তমোনাশ। ওর স্থির বিশ্বাস শুরুটাকে একবার কব্জা করে ফেলতে পারলেই, লেখা তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে।

আর পরতে পরতে খুলে যাবে তার মনের মধ্যেকার গুটিয়ে থাকা ভাবের পাতাগুলো।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবেই লিখে ফেলল—

'জ্ঞানে বাবাকে দেখিনি। শুধু দেয়ালে টাঙানো ছবিখানাই আমার বাবা। নেহাৎই সদ্য যুবক মূর্তি।....মা যখন বুড়ো হয়ে যাওয়ার পরও ওই যুবক মূর্তিটিকে ভক্তিভাবে প্রণাম করতেন, দেখে হঠাৎ যেন হাসি পেয়ে যেত। বাবা আমার কাছে শুধু এই ছবি। আমার জীবনে কাকা আর ঠাকুরদা। কাকাই হচ্ছে সর্বস্ব। আর ঠাকুরদা? আদর্শ। কাকা যেন একদম কাছের মানুষ আর ঠাকুরদা হচ্ছেন আকাশের চন্দ্র সূর্য, দূরের নক্ষত্র। চেহারার জন্যেও যেন অনেকখানি সমীহ। দীর্ঘ উন্নত দেহ, সোনার মতো রং। আভিজাত্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণো সৌম্য শান্ত ভাব। মাকে যখন বৌমা বলে ডেকে কিছু বলতেন মনে হত যেন দেবতা কথা কয়ে উঠলেন।

তবু মাঝে মাঝে ঠাকুরদা আমার কাছে যেন সহজ আপন হয়ে গল্প-টল্প বলতেন। পুরাণের গল্প, রামায়ণ মহাভারতের গল্প। আবার কখনো সাধারণ নিজস্ব বক্তব্যকে গল্পের ধাঁচে বলতেন।

মনে পড়ছে, একদিন বললেন, জানিস তমু, মানুষের এই দেহটা যেন একখানা সংসার। কর্তা গিন্নী ছেলে মেয়ে লোকজন কর্মচারী দাসদাসী নিয়ে বিরাট একখানা সংসার। মানুষের বাইরের মাপটি মাত্র সাড়ে তিন হাত হলে কী হবে, ভেতরে তিনশো হাজার কাণ্ড-কারখানা। মনে কর—বাড়ির খোদ কর্তাটি যেন মগজ। তিনি থাকেন একদম ওপরতলায়। কিন্তু যেন হাতের কাছে টেলিফোন, কলিংবেল —সেখান থেকেই পরিবারের সকলকে নির্দেশ দিয়ে চলেছেন। ওই কর্তাটি যদি খুব ধীর স্থির ঠাণ্ডা প্রকৃতির হন তাহলে সংসারে কোন এলোমেলো ভাব আসবে না। গরম প্রকৃতির হলেই মহা মুশকিল।

আর গিন্নী? গিন্নিটি হচ্ছেন হৃদযন্ত্র। তাঁর কর্তব্য অনলস খেটে যাওয়া। একবার বিশ্রাম করার জো নেই। কর্তাটি তো তবু একটু ঘুমোতে পান, কিন্তু গিন্নীর একটুখানি ঘুমোবার জো নেই। এক মুহূর্তের জন্যে ঘুমোলেন তো বাস! সংসার খতম! সে সময় তিনি বেশ জোরে হেসে উঠতেন।

তারপর বলতেন, গিন্নীর ওই অবিরাম কাজটি কী? সংসারে আর যারা সবাই খাটছে, তাদের নিয়মিত রসদ জুগিয়ে যাওয়া। এতটুকু এদিক ওদিক করা চলবে না। ঠিকমতো রসদটির জোগান না পেলে সবাই নির্ভুল নিয়মে খাটবে কেন? আসলে—যে যতই খাটুক, আসল দায়িত্বটি হচ্ছে গিন্নীর। তাকে সহিষ্ণু সর্বংসহা হতে হবে। হতে হবে—ধীর স্থির!

ছেলেবেলার শোনা এই গল্পটি লিখতে লিখতে হঠাৎ কখন যেন ঘুম এসে গিয়েছিল। বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা মতো হয়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে ছায়া ছায়া! আর কোথায় যেন কী একটা চেঁচামেচি হচ্ছে।....বুঝতে মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নিল।

না, চেঁচামেচি নয়। শুধুই সেই চিরপরিচিত কণ্ঠে চেঁচানি কলঝঙ্কার।—আমার ফিরতে একটু দেরী হয়েছে বলে কী মনের আনন্দে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলি? পাম্পটা সময়ে চালানো হয়নি। সারাদিনের পর এসে জল নেই। উঃ....এখন যদি কারেণ্ট অফ্ হয়ে থাকত, কী করতিস? কাজের মধ্যে শুধু খাওয়া আর ঘুম। পিটিয়ে পিটিয়ে যেটুকু আদায় করে নিতে পারি, সেইটুকুই ব্যাস।

অপরাধিনীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, তবে পাম্প চলার শব্দে বোঝা যাচ্ছে। এই মোক্ষম সময়ে কারেণ্ট অফ্ হয়ে যাবার মতো ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটেনি।

ধড়ে প্রাণ এলো তমোনাশের, তবে নিজেও কাঠগড়ায় দাঁড়াবার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি সঞ্চয় করতে থাকে।

এরপর বিদিশা স্নানপর্ব সেরে, অতি স্নিগ্ধ হয়ে, সারা ঘরে পাউডার ছড়াতে ছড়াতে, সর্বাঙ্গে পাউডারের প্রলেপ দিতে দিতে অবশ্যই দেওয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে এ মন্তব্য করবে, বাড়িতে যে কর্তা নামের একটা লোক থাকে, তা বোঝাবার উপায় নেই। অথচ চব্বিশ ঘণ্টা বাড়িতেই বসে। কত লোক রিটায়ারের পরও কত কী করছে।

এবং বিদিশার জানিত কারা কারা কী কী কর্ম সংস্থান করে চাকরি কালের থেকে বেশি রোজগার করছে তার ফিরিস্তি দিয়ে চলবে সাজতে সাজতে।

সাজটা আজকাল যেন বেশ একটু বেড়ে গেছে বিদিশার। আগে ড্রেসিং টেবলের সামনে দু-তিনটে শিশি কৌটো দেখা যেত, এখন অগুনতি। বাণিজ্যিক কোম্পানিরা যত জোগান দিয়ে চলেছে, ততই তার ব্যবহার বাড়বে, এটাই অবশ্য স্বাভাবিক। যদি বাড়াবার মতো বাড়তি রেস্ত থাকে। তা থাকে। মেয়েরা তো আজকাল সকলেই প্রায় স্বাবলম্বী।....

বিদিশার আজকালকার সাজ-সজ্জা দেখলে, মাঝে মাঝে যেন তমোনাশের একটু লজ্জাই করে। একজন প্রায়-প্রৌঢ়া, (প্রায় কেন প্রৌঢ়াই তো। সেকালে তো বলে বসতো বৃদ্ধা পঞ্চাশোর্ধ্ব তো)। স্কুল শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে এমন অতি-আধুনিকা সাজ কী সমীচীন? ছাত্রীদের কাছে এতে সমীহ পাওয়া যায়? তাছাড়া প্রথম জীবনে তো এমন ছিলে না তুমি বিদিশা। হ্যাঁ, সাজসজ্জা একটু পছন্দ কর বরাবরই। তা বলে পঞ্চাশ পার করে তুমি হঠাৎ ভুরু প্লাক করে বসবে? চুলের গোছ ছেঁটে বেঁটে করে ফেলবে? আর নিত্য নতুন রংদার জৌলুষদার শাড়ি পরে স্কুলে পড়াতে যাবে? জামার গলা আর হাতাও ছাঁটবে যত ইচ্ছে?

তমোনাশের মনের মধ্যে সর্বদাই এহেন প্রশ্ন যেন পানকৌড়ির মত কেবলই মাথা তুলে তুলে ওঠে আর ডুব দেয়! কিন্তু প্রশ্নটাকে কী পুরো ওঠাতে পারে উচ্চারণের মাধ্যমে? কোন্ প্রশ্নই বা পারে?

তবু স্নান স্নিগ্ধ হয়ে আজ বিদিশাকে ঘরে ঢুকে আসতে দেখে সাহসে ভর করে বলে উঠল তমোনাশ জল পেলে?

এটা অবশ্যই প্রশ্ন। তবে গুরুত্বহীন। বিদিশা বিরাট একখানা তোয়ালে গায়ে ফেলে তার কোণ তুলে ঘাড় মুছতে মুছতে নির্লিপ্ত গলায় প্রতি প্রশ্ন করল? না পেলেই বা কার কী এসে যেত?

ব্যাস, তার পর আর কী? বিদিশা তো এখন কিছুক্ষণ সারা

ঘরে পাউডার ছড়াবে।....প্রায় ভিজিয়ে আনা খাটো চুলগুলোকে তোয়ালে ঘষে ঘষে শুকিয়ে নেবে। তার সাহায্যকারী হিসেবে পাখার ব্লেডগুলো শেষ সীমায় ঘুরতে থাকবে।

তমোনাশ এখন মনে মনে উচ্চারণ করল, ভাগ্যিস কারেন্টটা রয়েছে। মুখে উচ্চারণ করতে সাহস পেল না।

তমোনাশের এই সময়টা ভারী মুশকিল লাগছে। বুঝে উঠতে পারছে না কিছু কথা বলা উচিৎ কিনা।

অথচ ঘর থেকে চলে যেতে পারছে না। কোনটায় যে বউয়ের মেজাজের পারা চড়ে উঠবে কে জানে।

কী ভাগ্যি! বিপত্তারিণী মূর্তিতে এসে দেখা দিল সেই অপরাধিনী। তবে আশ্চর্য দুঃসাহস মেয়েটার। এসে দিব্যি অনায়াস গলায় বললে, মাসিমা, আপনারে চায়ের সঙ্গে টোস্ট দেব না চিড়ে ভেজে দেব?

বিদিশা ঘাড় না ফিরিয়েই বলল, কিচ্ছু দেবার দরকার নেই। শুধু দুটো বিস্কুট দাও।

তমোনাশ ভাবল রাগের প্রতিক্রিয়া হঠাৎ দুঃসাহসে ভর করে বলে বসল, আহা, কিছু দেবে না কেন? খিদের সময়।

বিদিশা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, বোর্ড মিটিং ছিল স্কুলে চা খাওয়া হয়েছে।

তবু ভালো। কিন্তু তারপরই একটু দুঃসংবাদ পরিবেশন করল তমোনাশের বউ। রবিবারের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে কী বাবদ পর পর তিন দিন ছুটি পড়েছে বিদিশার স্কুলে।

তার মানে, আজকের চাপা দেওয়া খাতা-পত্ররা তিন তিনটে দিন আলোর মুখ দেখতে পাবে না।

আচ্ছা, তমোনাশের কি এটা অমানবিকতা নয়? হঠাৎ বউয়ের পর পর তিন দিন ছুটি পড়াকে দুঃসংবাদ মনে করা?

তমোনাশ যখন অফিস যেত, ক্যালেন্ডারের দাক্ষিণ্যে, যদি তার এ রকম ছুটি জুটে যেত বিদিশা তো রীতিমতই উল্লসিত হতো।

শৌখিন কিছু রান্নারও আয়োজন করত।

জীবনটা অবশ্য বহু পর্যায় পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে।.... মা আর কাকা থাকতে একটা পর্যায়, মা চলে যাবার পর শুধু কাকা থাকাকালীন, মেয়েরা ছোট থাকতে এক রকম, আবার একে একে বড় হয়ে ওঠার কালে।....এবং একে একে বিয়ে শাদী হয়ে চলে যাওয়ার কালটায় পর্যায়ক্রমে এক এক রূপ জীবনের। তবু—কোন পর্যায়েই তমোনাশের হঠাৎ পেয়ে যাওয়া কোন ছুটি শুনলে বিদিশা দুঃসংবাদ ভেবেছে, এমন মনে করতে পারল না।

মনে মনে লজ্জিত হল তমোনাশ নামক ভদ্র ব্যক্তিটি যদিও তখন কেবলমাত্র তিন তিনটে দিন অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্বাধীনতা হারাবার আশঙ্কাটুকু ছাড়া আর বিশেষ কোন আশঙ্কা ছিল না।....আশঙ্কা ছিল না ওই তিনটে দিন তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাবে।

তা এটাও তমোনাশের মানসিক স্বার্থপরতা। তার বউ যেটাকে মলয় বাতাস মনে করেছে তমোনাশ তাকে ঝড় ভেবেছে।

॥ সাত ॥

পরিবর্তনশীল চক্রের নিয়মে বিদিশাদের টালা পার্কের বাড়িতেও পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিছু দিন যাবৎ আর বিদিশা সুযোগ পেলেই যখন তখন স্কুল ফেরত, অথবা ছুটির দিনে মায়ের কাছে যাচ্ছে না। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে বাবা বিহীন বাপের বাড়িটা আস্তে আস্তে মায়ের বাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইদানিং সেই রংটাও বদলে যেতে বসেছে। অথবা বলতে পারা যায় বদলে গিয়েইছে।

বেকার ছোট ভাইটা হঠাৎ কোন্ এক বিগ ব্যক্তির একমাত্র মেয়ের সঙ্গে লট্‌কে পড়ে তার আণ্ডারে একটা চাকরি পেয়ে গিয়ে বিবাহান্তে শ্বশুরবাড়িটাকে বাড়ি করে নিয়ে এবাড়ি থেকে প্রস্থান করেছে। এবং তার ঘর বলে গণ্য ঘরখানায় চাবি বন্ধ করে রেখে গেছে। দরকারি জিনিসপত্র আছে বলে।

আর দাদা বৌদি? বাড়িতে থেকেও আশ্চর্য রকম ভাবে না থাকার ভূমিকায় কাটাতে শুরু করেছে।

দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে যেন না দেখতে পাওয়ার ভান করে সরে পড়ে। কিম্বা ভয়ানক জরুরী কাজে ব্যস্ততার ভানে, কি রে? কখন এলি? বলেই উধাও হয়ে যায়।

আর বৌদি? মোমের মত মুখ, ভারী সৌজন্যে ভরা মিষ্টি মাপা হাসি নিয়ে বলে, বিদিশা যে? স্কুলে আজ কাজ কম বুঝি?

ব্যস, আর কোন উচ্চবাচ্য নেই। ধরে নেয় ননদটি মা'র অর্থাৎ শাশুড়ি মা'র বিজনেস।

ছোট ভাই গিয়ে বড় গাছে নৌকা বেঁধে বসার পরই মায়ের ওপর হঠাৎ বেজায় বিরূপ হয়ে বসেছিল এই একাত্ম দম্পতিটি। কারণ বউয়ের নাকি ঐ দেওরটি তার পিতৃকুলের কোন্ এক অখদ্যে অবদ্যে কন্যের জন্যে টার্গেট ছিল।

ঠিক করা ছিল, নেহাৎ বেকারত্বটা ঘুচলেই, একদিন বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে ফেলবে তাকে। বৌয়ের ওই দূর সম্পর্কের পিসির না মাসির কার সেই মেয়েটা না কি দুর্দান্ত কাজের। বাড়িতে কাজের মেয়ে নেই, তবু সে বাড়ি তকতকে ঝকঝকে, দেখলে চোখ জুড়োয়। মাকে রান্নাঘরের দিকে যেতে দেয় না।

এমন একখানা মেয়েকে বংশবদ ভাবে পাবার আশাটিকে মনের মধ্যে লালিত করতে করতে যদি হঠাৎ দেখে, পাখি হাতছাড়া, কে না বিরূপ হয়? সেই বিরূপতার ফলে বিদিশার মা'র বড় ছেলে বৌ বাড়ির মধ্যে থেকেও হাঁড়ি ভিন্ন করেছে।

বিদিশা অবাক হয়ে বলেছিল, আচ্ছা মা, হাঁড়ি আলাদা আবার কী? তুমি তো সংসারের হাঁড়িতে খেতে না। আলাদাই খেতে যা হোক একটু কিছু রান্না করে নিয়ে।

মা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিল, তো সেটুকুর দায়ই বা ও একা নেবে কেন? ছেলে যখন দুটো।....আমার খরচার অর্ধেক দিতে বাধ্য হবে দুজনই। এখন যখন খোকাও আর বেকার নেই।

এই পরিস্থিতিতে এখন বিদিশা আর যখন তখন মায়ের বাড়ি ঘুরে আসতে যায় না। সুবিধে পেলে মাকেই নিয়ে আসে।

এবারে ওই তিন দিনের জন্যে নিয়ে এলো। তবে এবার আবার সঙ্গে একটি ল্যাংবোট নিয়ে। তিনি হচ্ছেন মায়ের মা। বিদিশার দিদিমা। তিনিও যে এখন সময় অসময়ে শরীর টরীর খারাপ হলে মেয়ের কাছে চলে আসতে পারছেন না। মেয়েই হঠাৎ নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে পড়েছে। এবার এসেছেন হঠাৎ একটা রোগে পড়ায় চিকিৎসা করাতে।

তা তাঁরই কী ছেলে নেই? আছে একটা। তো সে ছেলে তো সেই কোন্ কাল থেকে বিদেশবাসী। দু চার বছর অন্তর যদি দেশে আসে, তো এসে ওঠে শ্বশুরবাড়ি। মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যায়।

এই হচ্ছে পারিপার্শ্বিক চিত্র। এই ভাবেই কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। তমোনাশের বাড়িতে তার শাশুড়ির মা আসেন ডাক্তার দেখাতে।

দিদিশাশুড়ির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, এবং সে বিষয়ে সব ব্যাপারে তেমন চৌকসতায় পরিচয় দিতে না পারায় বৌ এবং শাশুড়ি দুজনের কাছেই হেয় হতমান্য, সমালোচনার এবং হেনস্থার পাত্র হয়ে থেকে কোন মতে দিন কটা কাটিয়ে, পরদিন বেলা দশটার পর তমোনাশ যেন মেঘ সরে যাওয়া আকাশের মুখ দেখতে পেল।

বড় আশা জাগানো এই আলোটি। সেই খাতা কাগজগুলো যেন অবৈধ প্রেমের আকর্ষণের মতো ভিতরে ভিতরে টেনে চলেছে।

স্কুলে যাবার সময়ই মা দিদিমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে বলে একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনেছিল বিদিশা সোনালিকে দিয়ে। বেরোবার সময় একটু আক্ষেপের সুরে বলল, ঠিক এই সময় স্কুলের সেক্রেটারির ওপর অনাস্থা ভোটের তোড়জোড় চলছে, না গিয়ে উপায় নেই। না হলে ছুটি নিয়ে আর কদিন রাখতাম তোমাদের। আমার সংসারের অবস্থা তো দেখে গেলেই।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। তমোনাশের মনে পড়ল আজ আর বিদিশা নিত্য অভ্যস্ত বুলিগুলো বলল না।

তবু তমোনাশ আজকের আলো-আলো আকাশের স্বাদটি মনে নিয়ে তখনই ভেবে ঠিক করল, আজ আর ভুল করব না।....সকাল করে নাওয়া-খাওয়া সেরে নিয়ে লেখাটা নিয়ে বসব।....তার আগে অবশ্য খোঁজ নিতে হবে, সময় মত পাম্প চালানো হয়েছে কিনা। ছাদ থেকে শুকনো কাপড় জামাগুলো তোলা হয়েছে কিনা।....কোন কোন দিন সে রকম অভিযোগও কানে আসে।

আজও বাড়িটা আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধ লাগছে। তিন দিন ধরে তিন প্রজন্মের তিনটি মহিলার কলকণ্ঠের নাগাড় কলকল্লোল বাড়িটার জানলা দরজা দেওয়ালগুলোকেও যেন ঝাঁজরা করে চলেছিল।

এত কথা কোথায় পায় ওরা? বলে চলেই বা কী করে? তমোনাশের মধ্যেও তো কত কথা। কিন্তু প্রকাশ করতে বসলে তো কথার পর কথা তেমন জোগায় না। ভরসা এই—বেশ খানিকটা লেখার পর সড়গড় হয়ে যাবে।

কলম নিয়ে বসামাত্রই সেই জ্যোতির্ময় পুরুষটির ভরাট কণ্ঠস্বরটি মনের মধ্যে বেজে ওঠে—আচ্ছা বৌমা, বল তো ঘরে একটা শিশু জন্মালে, কেন বলা হয় তাকে 'মানুষ' করে তুলতে হবে? আর বলে এমন ভাবে যেন সেটা বেশ দুরূহ কাজ। না না, তুমি এমন বল তা বলছি না। তবে সব সংসারে সবাই বলে। বলে না? বলে না—'ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করতে হচ্ছে'। তা এ কথাটা বলে কেন বল তো? মানুষের ঘরে মানুষের পেটে ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হয়েই জন্মায়। পাখি পক্ষী কীট পতঙ্গ হয়ে তো জন্মায় না। ডিমের খোলের মধ্যেও না। মনুষ্য রূপেই তো ভূমিষ্ঠ হয়। তবে? 'মানুষ করা' কথাটা এসেছে কী সূত্রে?....কী— কথাটার মানে বুঝতে পারছ না? এত আস্তে কথা বল তুমি মা, বোঝা দায়।

কথাটা যখন উচ্চারিত হচ্ছিল তমোনাশ নামের ছেলেটার তখন কত বয়েস? তা মনে পড়ছে না।....তবে সেই চিত্রটা হঠাৎ মনে

পড়ে গেল। একটা ইজের আর হাতকাটা গেঞ্জি পরে, একটা লাট্টুতে লেত্তি জড়াবার চেষ্টা করছে। হাতের কাজ থামিয়ে একবার মায়ের বিপন্ন মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে গলা তুলে বলে উঠল, শুনতে পাওনি দাদু? মা বলছে, ছোট্ট বাচ্চা নিজে কিছু করতে পারে না, তাকে তো দেখাশুনো করতেই হবে।

ঠিক। হ্যাঁ দাদু, তোমার মা ঠিক কথাই বলেছেন। মায়া-মমতা-সেবা-যত্ন-পরিচর্যা, এসব তো করতেই হবে। সে তো সংসারে একটা বেড়ালছানা কুকুরছানা এসে পড়লেও করতে হয়। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে বড় করে তুলতে।....কিন্তু এ কথা কী বলা হয়— এটাকে বেড়াল করে তুলতে হবে? কি এটাকে কুকুর করে তুলতে হবে?

তমোনাশ দেখতে পাচ্ছে, ছেলেটা হি হি করে হেসে উঠে বলে উঠল, কুকুরকে আবার কুকুর করতে হবে কী? বেড়ালকে আবার বেড়াল করতে হবে কী?

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষটির মুখেও হাসি। আমিও তো তাই বলছি দাদু। মানুষকে আবার মানুষ করে তুলতে হবে কী? তার মানে কথাটার একটা তাৎপর্য আছে।

কী 'পয্যো' আছে দাদু?

আরে সে তোমার মা বুঝেছেন হে। সেটাই জিজ্ঞেস করছিলুম ওকে।

এই সময় কাকা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, ও। আপনি ঠাকুর রামকৃষ্ণর সেই মানহুঁশের কথা বলছেন বাবা?

বুঝতে পেরেছ তো? বৌমাকে সেই প্রশ্নটিই করছিলুম।

তমোনাশের আর বেশি মনে পড়ছে না। সে প্রশ্নের কী উত্তর হয়েছিল কে জানে।....তবে মনে হচ্ছে দাদুর সেই বৌমা বোধ হয় সে প্রশ্নের সম্যক উত্তর দিতে ফেলিওরই হয়েছিলেন তাঁর জীবনে।

মান হুঁশ। সেই 'মান'টা কী? অভিমান? অতিমান। অহমিকা? অহঙ্কার? আমি মানুষ এই সম্পর্কে হুঁশ? তা

কোনটাই কী তেমন জোরালো ভাবে দেখতে পাচ্ছে নিজের মধ্যে? না। দাদুর কথার তাৎপর্য বুঝে ফেলা মায়ের হাতে-গড়া তমোনাশ দৈনন্দিনের 'আপাত শান্তি' নামক তুচ্ছ একটু খেলনা কিনে কিনে চলেছে—সেই দামী জিনিসটা বিকিয়ে বিকিয়ে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে উঠতে ভয়—শান্তি নষ্ট হবে। ন্যায়ের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে ভয়—যদি শান্তি নষ্ট হয়।

জগতের আর কারো কাছে নয়। কেবলমাত্র একটি রমণীর কাছে এই বেকুব আত্মসমর্পণ।

হ্যাঁ। ঠাকুরদার ভাষণে এ কথাও শুনেছে—নারী হচ্ছে মহা-শক্তির আধার। নারী দেবপূজ্যা....নারীই সংসারের লক্ষ্মী। যে সংসারে নারীর যথার্থ মর্যাদা নেই, সে সংসার শ্মশানতুল্য।

সংস্কৃত শ্লোক ভেঙে ভেঙে এ সব ভাষণ দিতেন ঠাকুরদা। হঠাৎ হঠাৎ।

তমোনাশ ভাবতে চেষ্টা করে—আশ্চর্য! এ হেন কথাও আছে আমাদের শাস্ত্রে? তবে কেন....? আচ্ছা 'যথার্থ মর্যাদা' মানেটা তা হলে কী?

নাঃ। ভাবতে গেলে মাথা গুলিয়ে যায়। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষটিকে যদি একবার হাতের কাছে পাওয়া যেত। জিজ্ঞেস করা যেত সেই 'শক্তি'টি কত অশ্ব-শক্তি দাদু?

আশ্চর্য! খাতা কলমে হাতে করলেই বহুদিনের বিস্মৃতির জাল ভেদ করে স্মৃতিরা এমন স্পষ্ট হয়ে উঠে আসে কী করে?

জীবনের পঁয়ত্রিশটা বছর যাবৎ তো একটা অন্ধ বধির বোদা সরকারের বস্তা বস্তা ফাইলের নিচে চাপা পড়ে থেকে কেটে গেছে। সেই ফাইলগুলো উদ্ধার করতে পারাটাই জীবনের পরামর্শ বলে মনে হয়েছে। সেটা হারিয়ে ফেলেই শূন্যতার হাহাকারে মন ভেঙে পড়েছিল। তাই না কলম নামের জিনিসটাকে আবার হাতে তুলে নিয়েছে।....ফাইল শব্দটা অর্থহীন হয়ে গেছে। ভাগ্যিস তমোনাশ হঠাৎ অবসর জীবনের অগাধ অবকাশের শূন্যতাটা ভরাট করে তুলতে

এইটা আবিষ্কার করে বসেছিল।

সারাদিনে গোটাকতক ঘণ্টা সময় পেলে তমোনাশ খসড়া লেখা-গুলো খাতায় তুলবে।

তা পাচ্ছে সময়। পর পর কদিন রোজই বিদিশার স্কুলে নানা কাজ বাবদ ফিরতে দেরী হচ্ছে। আর এদিকে তমোনাশ সোনালিকে অবহিত করিয়ে রেখে দেয়—দেখিস বাবা, তোর মাসিমা যেন এসে রাগ করতে না পারে॥

তখন সোনালি অবশ্য গা মোচড় দিয়ে বলে, মাসিমা তো অকারণই রাগ করে।

তবে অবহিত থাকে বলেই মনে হয়।

॥ আট ॥

লিখতে এত ভালো লাগে? একটা পোস্ট কার্ড লেখাই যার বাঘ ছিল সে এখন পাতার পর পাতা লিখে চলেছে? দেখে নিজেই মোহিত হয়ে যায় তমোনাশ। এমন কথাও ভাবছে এখন তমোনাশ, ইচ্ছে মত লিখে লিখে পাতা ভরাতে এত আনন্দ তা জানলে সরকারি অফিসে ঢুকে পড়ে ফাইলের বস্তায় চাপা পড়ে না থেকে তার সহপাঠী বন্ধু সমীরণ মজুমদারের মতো লেখাটাই পেশা করে ফেলত। কথায় বলে—লিখতে লিখতেই সরে।

সমীরণের এখন কত নাম-ডাক। ওর লেখা বাজারে বেরোলে নাকি পড়তে পায় না। প্রকাশকরা বাড়িতে ধর্ণা দেয়। লেখার দৌলতে বাড়ি-গাড়ি। আরো কত কী। আর খাতিরের তো অবধি নেই।

অথচ স্কুলে এমন কিছুই ছিল না। বরং মুখচোরা প্যাটার্ণেরই ছিল। অনেকের সঙ্গে মিশতে পারত না, এক আধটি বিশেষ বন্ধু ছিল। ক্লাসে নম্বর পেত কম।

সমীরণের বই অবশ্য বিশেষ পড়েনি তমোনাশ। বাংলা খবরের

কাগজের রবিবারের সংখ্যায় এক আধটা ছোট গল্প পড়েছে যেন। তখন ঠিক জানত না। এই সমীরণ মজুমদারই তার ক্লাস ফ্রেন্ড সেই সমীরণ।

ছোট শালা যখন খুব আসত তখন ভাইবোনের গল্পের মধ্যে থেকে কথাটা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল।

ওদের কথাতেই শুনেছে, প্রথমেই সে না কি একখানা উপন্যাস লিখেছিল, আত্মকথা বা স্মৃতিচারণ গোছের। আর তাতেই না কী ফাটিয়ে দিয়েছিল।

তাহলে জগতে কিছুই অসম্ভব নয়। এই কথাটি অবশ্য খেয়াল করে না তমোনাশ, ওই ফাটাফাটিটা করেছিল সমীরণ উনষাট বছর বয়সে নয়, উনত্রিশ বছর বয়েসে। কিন্তু অত হিসেব কী মাথায় আসে?

ঠাকুরদার পরিচ্ছেদ ছেড়ে কাকার কথা ধরেছিল আজ তমোনাশ।

কাকা বলত, তোর মা আমায় বিয়ে বিয়ে করে কম উৎপাত করেখে এক সময়? আমি বাবা ঘাবড়াইনি।....রোজ রোজ কোথা থেকে একগাদা মেয়ের ফটো নিয়ে এসে আমায় দেখাতে বসত। একদিন একখানা মোক্ষম চাল দিলাম। বললাম—বাড়িতে আর একখানা বিধবা বাড়ুক এটা চাও? জ্যোতিষী বলেছে, বিয়ে হলেই বছরের মধ্যে মৃত্যু। হা হা হা!

ব্যস। সেইখানেই শিউরে উঠে উৎপাত স্টপ। আসলে তোর 'বাবাও তো বিয়ের এক বছরের মধ্যেই—''....দেখনি তো কেমন চালাকিটি খাটিয়ে পার পেয়ে গেলাম।....কেমন ঝাড়া হাত পায়ে আছি। কী রে কী বলিস? 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে—' তোর কথা বলছিস? তোর কথা আলাদা। তোর মা জীবনে 'সংসার বলতে কী পেয়েছে বল? তা ছাড়া—তুইও আমার পথ নিলে হাতিবাগানের এই বাঁড়ুয্যে বাড়িটার ধারা লোপ পেয়ে যাবে না? ....সেটা কী ঠিক হবে?

লিখতে লিখতে প্রতিটি কথা মনে পড়ে যায়। আর সবই

লিখে ফেলতে ইচ্ছে করে। কতটুকু ধরে রাখতে হয় আর কতখানি ফেলে দিতে হয় সেই মাত্রাজ্ঞানটা আয়ত্তে আসে না।

অতএব খাতা ভর্তি হয়ে আবার নতুন খাতা কেনার দরকার পড়ে। আর কাকার এই কথাটা লিখতে লিখতে মনে মনে হেসে উঠে ভাবে, ভারী হিসেবি ভেবেছিলে তুমি নিজেকে, কেমন? বলি তোমার ভাইপোর এই যে গোটা তিন চার ইস্যু হল। কে তোমাদের বাঁড়ুয্যে বংশের ধারা বহন করার কাজে লাগল? মানুষ ভাবে এক, আর ভাগ্যে ঘটে আর।

মনে মনে এই দার্শনিক উক্তিটি করে কী তমোনাশ ভেবেছিল প্রবাদটা তার ভাগ্যে হাতে হাতে ফলে যাবে?

নতুন খাতাখানা কিনতে যাচ্ছে, বেরিয়েই দেখে দরজার কাছে একটা কালো কুচ্ছিৎ গ্রাম্য চেহারার লোক দাঁড়িয়ে, বোধ হয় দরজার বেল বাজাতে জানে না! নাড়া দেবার জন্যে কড়াও খুঁজে পায়নি। তাই বোকার মতো দাঁড়িয়ে ইতি উতি তাকাচ্ছে।

কে?

চমকে উঠল তমোনাশ। এই সন্ধ্যার মুখে আবছা বেলায় এ ভাবে দাঁড়িয়ে কে?

তবু ভাগ্যি বিদিশা ফিরেছে। স্নান সেরে চা খাচ্ছে দেখে তমোনাশ বলে উঠেছিল—তোমার কিছু আনবার আছে?

হঠাৎ এ প্রশ্ন?

না, মানে একটা ব্লেড কেনা দরকার, তাই ভাবছি, সকালে দোকানে বড় ভিড় থাকে এখনই একটু ঘুরে আসি।

বুদ্ধি করে ব্লেড বলল। কারণ, তেল সাবান টুথপেস্ট কী সিগারেট বললে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা।....কোন্‌টা এই দণ্ডে আনা দরকার অথবা দরকার নেই সেটা তৎক্ষণাৎ তদন্ত করে ফেলে এ সময় বেরোবার যৌক্তিকতাটি বিবেচনা করে তবে রায় দেবে বিদিশা।.... ব্লেডটা সম্পর্কে তেমন হবে না।

সিগারেটটা যে তমোনাশ বিশেষ খায় তা নয়। তবে বিদিশার

শখে ধরেছে। এক আধটা খায়।....বিদিশার মতে ঘরের টিবিলে একটা সুন্দর অ্যাশট্রে আর সিগারেট কেস পড়ে না থাকলে, ঘরের সাজটা সম্পূর্ণতা পায় না।

সেই সূত্রে—এক আধটা খেয়ে দেখতে দেখতে সামান্য অভ্যাস। তা বলে বেশি নয়। এখন মনে হচ্ছে এটা মন্দ নয়। লেখক হতে হলে কিছু একটা নেশা না থাকাটা যেন ঠিক মানায় না।

তবে বিদিশার ওই ঘর সাজানোর সম্পূর্ণতা আনার কথায় আবার সেই ঠাকুরদার একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সেটাও কী লিখে ফেলবে? মনে পড়লে সবকিছুই দামী মনে হয়। তুলে রাখার ইচ্ছে হয়।

মনে পড়ছে কোন এক আত্মীয়র ছেলে একটু জমি কিনে বাড়ি করছে শুনে ঠাকুরদা খুব সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ভালো। বেশ ভালো। তোমার বাবার তো সারাজীবনটা ভাড়া বাড়িতেই কেটে গেছিল।....তো কেমন বাড়ি করছ? বাড়ির প্ল্যানে একটু ঠাকুর ঘর রেখেছ তো? হিন্দুর সংস্কৃতিতে ওটা খুব আবশ্যিক।'

তমোনাশ তখন যদিও বালক তবু মনে আছে। উত্তরে সেই তিনি মুখটা কাঁচুমাচু করে বলেছিলেন, 'ঠাকুর ঘর....? ইয়ে, আলাদা ভাবে তেমন কিছু হচ্ছে না। জমি তো কম। ভাঁড়ার ঘরের দেয়ালে কটা দেয়াল আলমারি করা হচ্ছে, মা বলেছেন, ওর মধ্যেই একটায় ঠাকুর রাখা চলবে।'

আলমারির মধ্যে চাবি বন্ধ হয়ে ঠাকুর। ঠাকুরদার মুখে একটু কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছিল। আর সেই হাসিটি মুখে মেখেই বলেছিলেন, 'দ্যাখ বাপু, আমাদের হিন্দু সমাজের চিন্তায়—এই সংসার ক্ষেত্রটি হচ্ছে একটি তীর্থক্ষেত্র। আর সংসারী লোকদের পক্ষে তার বাসগৃহটি যেন একটি মন্দির। তা মন্দিরে যেমন একটি বিগ্রহ থাকা আবশ্যিক, বাসগৃহেও তেমনি একটি ঠাকুর ঘর থাকা আবশ্যিক। নইলে গৃহের সম্পূর্ণতা আসে না।....তা ছাড়া ওই ঠাকুর ঘরটি তো পরিবারের কারো একার নিজস্ব বলে গণ্য হয় না।

এমনি বাড়িতে যেমন দ্যাখ, অমুকের ঘর, তমুকের ঘর, বাইরের ঘর, চাকরদের ঘর—ঠাকুর ঘরটি তেমন নয়।....যার যখন ঠাকুরে মতি আসবে. সে-ই চলে আসবে ঠাকুর ঘরটিতে।....আর ব্রাহ্মণ বাড়িতে তো স্বভাবতই একটি গৃহ বিগ্রহ থাকেই, তিনিই ওই ঠাকুর ঘরে অবস্থান করেন। এই যেমন আমাদের এখানে—দামোদর। আমার মামার বাড়িতে—শ্রীধর।'

সেই আত্মীয়টি খুব আস্তে বলেছিলেন, 'আমাদের বোধহয় সে সব দেশের বাড়িতে আছে।'

ঠাকুরদা বলে উঠেছিলেন, 'তা হলে তো উত্তম। বাস্তুভিটেই তো বিগ্রহের আসল জায়গা!'

কথাগুলো লিখতে লিখতে তমোনাশের হঠাৎ মনে হল. আচ্ছা, সেই দামোদরের কী হল?....মনে হচ্ছে কাকাকে স্নানের পর একবার সেই ঠাকুর ঘরে ঢুকতে দেখা যেত। কাকা মারা যাবার পর?

আশ্চর্য! আমি কী? কই একদিনের জন্যেও তো....মনে পড়েনি! তিনতলার ছাদে ওঠার সিঁড়ির মাথায় যে একটা ছোট্ট ঘর ছিল যাকে 'ঠাকুর ঘর' বলা হত, ছেলেবেলায় বিশেষ বিশেষ কোন দিনে তমোনাশকে বোধ হয় সেই ঘরে যেতে হত প্রণাম করতে। কিন্তু তারপর? ঘরটায় কী আছে এখন?

কে জানে। মনে হচ্ছে মিস্ত্রী লাগার সময় দেখেছে, বাড়ির যত সব আলতু ফালতু জিনিস জমানো আছে সেখানে।

তমোনাশের তো উচিত ছিল কাকার পরে ওই ঘরটার ভার নেওয়া। খেয়ালেই আসেনি। এখন আর নতুন করে সেই উচিত কাজটা করতে যাওয়া যায়? ইচ্ছে হলেও লজ্জা আসবে।

এমনিতে তো ওই সব পুজো আচ্ছা ঠাকুর দেবতার কিছুই জানে না। তার ওপর ভয় আছে বিদিশার ব্যঙ্গ হাস্যের। তমোনাশ যে কখনো বাসি গেঞ্জি পায়জামা পরে চা খায় না, জীবনে কখনো বেড্‌টির আস্বাদ জানল না, এই নিয়েই বিদিশা কত হাসাহাসি করে, কত ঠোঁট ওলটায়, মুখ বাঁকায়। এ সব উপেক্ষা করে আবার নতুন কিছুর পত্তন

করা ? ও বাবা ! তমোনাশের সে এলেম নেই।

বাবু ! ডাকটায় চমকে উঠল তমোনাশ।

ওঃ দরজার পাশে আধো আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই কেলে কুচ্ছিত লোকটা। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি তমোনাশের। কীরে বাবা ! কী মতলব ! একা না পিছনে আরো লোক আছে ? যা দিনকাল। এই যে এখন নিরীহ ভাব। হঠাৎ অন্য মূর্তি ধরে কিনা কে জানে। তবু গলা ঝেড়ে বলে, কী, কাকে চাই ?

এজ্ঞে আমি সোনালির বাপ। তারে একবার ডেকে দেবেন ?

ওঃ। সোনালির বাপ। তবু ভালো। তবে যাওয়ায় বাধা পড়ে। ভিতরে এসে বার্তাটি জানাতে হয়।

সোনালির বাপ ! বিদিশা চমকে উঠে বলল, কেন ? হঠাৎ কী করতে ?

কী করতে তা কী করে জানব ? মেয়েটা কোথায় ? ডেকে দাও।

বিদিশা দাঁতে দাঁত চেপে বলে, থাক, এক্ষুণি ডেকে দিতে হবে না। বলে দাওগে ও কাজে ব্যস্ত আছে। একটু অপেক্ষা কর।

কী আশ্চর্য ! তাই কখনো বলা যায় ? কী ভাববে ?

কী আবার ভাববে ? এখানে মেয়েকে দিয়ে গেছে কাজের জন্যে না খেলা করতে ?

আহা তা হলেও—এত কাজ যে দেশ থেকে বাপ এসেছে, একবার দেখা করতে আসতে পারবে না ? এটা কেমন দেখাবে ? ভাববে কী খাটুনি খাটে মেয়েটা।

এতে বিদিশা একটু থমকায়। কথাটা অনুধাবন যোগ্য। লোকটা যদি বেল বাজাত, সোনালিই দরজা খুলে দিতে যেত। হতাশ ভাবে বলে, তবে দিচ্ছি ডেকে। কালকের কুটনোটা কুটে রাখছিল। বাপ এসেছে শুনলে আর মাথার ঠিক থাকবে ? নাচতে নাচতে গিয়ে গল্পে ডুবে যাবে।....হয়ে গেল আজকের মতো দফা গয়া।

হায় ! বিদিশা নামের মহা বুদ্ধিমতী মহিলাটিও কতটুকু

দূরদর্শী ?....দফা রফা শুধু কি আজকের মতই হল ? কিন্তু কার দফা ?

সোনালীর বাপ বলল, হাত কচলে, মেয়েডারে তো এবার ছেড়ে দিতে হয় মা। ওর বে-র ঠিক করেছি।

বিদিশা প্রায় আঁৎকে উঠে বলল, সে কী ! ওইটুকু বাচ্ছা মেয়ের আবার বিয়ে কী ?

আমাদের গাঁয়ে ঘরে ওরে বাচ্ছা বলে না মা। বে না দিতে পারলে নিন্দা হবে। তা বয়স তো হল চোদ্দ-পনেরো।

বিদিশা ফস করে জ্বলে উঠল, মোটেই চোদ্দ পনেরো নয়, বড় জোর তেরো হতে পারে। জানো এমন বয়েসে বিয়ে দিলে পুলিসে ধরে।

হাত কচলানি ছেড়ে লোকটা আগ্রহের গলায় বলে, পুলিশে অমনি ধরলিই হল ? আমার মেয়ের বয়স আমি জানি না ? ভোটবাবুদের খাতায় শুধু ওর কেন ওর ছোটটা, মুনালিটারও তো নাম উঠে গেছে। সেও ভোট দেবার উপযুক্ত হয়েছে। আর এটা তো তার থেকে তিন বছরের ডাগর।

বিদিশা তবু বেহাল হয়ে যেতে বসা হালটাকে শক্ত করে চেপে ধরে।—ভোটে অমন অনেক ভুলভাল হয়। তবে বিয়ের ব্যাপারে আইন আছে।

ও কথা বাদ দেন। আইনডা মানছে কে ? ওরে একবার ডেকে দেন, বলে যাই যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে। কাল ভোরে নে যাব।

কী ! কাল ভোরেই ? আবার রণমূর্তি।—বলি মেয়ে কি তোমার মামার বাড়ি বেড়াতে এসেছে ? তাই হুট করে নিয়ে যাব বললেই নিয়ে যাওয়া যাবে ?

লোকটা আশ্চর্য সংযম দেখায়। গম্ভীর আত্মস্থ গলায় বলে, আজ্ঞে উপায় নেই। বে-টাও হুট করে স্থির হল কি না।

একেবারে এমন স্থির হল যে কালই নিয়ে যেতে হবে ? কবে বিয়ে ?

এজ্ঞে সামনের সোমবারে।

সামনের সোমবারে! মেজাজের পারা ঝপ করে খানিকটা নেমে যায়। সামনের সোমবার! তবে তো এখনও সময় রয়েছে। সামনের শনিবারই নিয়ে যেও। আমিও তো ওর বিয়েতে কিছু দেব-টেব।

সে তো আপনারা দিতেই পারেন। ভালবাসেন ওডারে।

লোকটাকে মনে মনে সেলাম ঠোকে তমোনাশ। কি অবিচলিত আত্মস্থতা! স্পষ্টত উৎকোচের প্রস্তাবে মুখের চেহারার কোন হেরফের ঘটে না। গভীর গাম্ভীর্যের স্বরে বলে, আজ্ঞে তাই কি হয়? বে-র আগেই কত নেয়ম কানন আছে। গরীবের ঘরে, ঘটা না থাক ল্যাঠাটি তো আছে। কাল ভোরেই যেতে হবে। আমার আজ্ঞে কাজ আছে বেস্তর। তো ঠিক ঠাক হয়ে থাকিস সোনালী। তোর মা পৈ পৈ কয়ে রেখেছে অন্যেথা না হয়।

বলা বাহুল্য, সোনালীকে ডেকে দিতে হয়নি। দরজার বাইরের এই বাদ-বিতণ্ডা সে রান্নাঘরে বসেই টের পেয়ে চলে এসেছে। এবং আলোচনার বিষয়বস্তু বুঝে ফেলে টু শব্দটি করেনি। বাপকে কোন সৌজন্য সম্ভাষণ পর্যন্ত দেখাতে আসেনি।

অতঃপর? অতঃপর ঘণ্টা দুই ধরে বলতে গেলে কথার ধস্তাধস্তি। তবে একপক্ষই আক্রমণকারী অপরপক্ষ কেবলমাত্র আত্মরক্ষাকারী। সেদিকে একটা মাত্রই অস্ত্র—'উপায় নাই। পাকা কথা হয়ে গেছে।'

আর এ পক্ষে? অনুনয় বিনয় আস্ফালন শাসানি। কখনও রুদ্রমূর্তি, কখনও অশ্রু ছলছল। বলতে গেলে শুধু পায়ে ধরতেই বাকি রেখেছিল বিদিশা। তার সঙ্গে তোয়াজী অতিথি আপ্যায়নের সুর। যেমন—

আহা বাপু কথা পরে হবে, এখন তেতে পুড়ে এসেছ, একটু হাত মুখ ধোও, চা জল খাও।....ও সোনালী, তুই তো আচ্ছা মেয়ে। বাবা এসেছে, এক গেলাস জলও তো দিবি। সবই তো তোর হাতে। যা চটপট একটু চায়ের জল চাপিয়ে দিগে।....ইয়ে—তোমার নাম কি যেন?

আজ্ঞে সহদেব মণ্ডল।

তা সহদেব রাত হয়ে গেল তো। এত রাত্তিরে কোথায় কী খেতে যাবে? এখানেই মেয়ে দুটি ভাতে ভাত চড়িয়ে দিক।

কী মমতা! কী হৃদয়বত্তা!

তবু তমোনাশের হঠাৎ মনে হল—কী নির্লজ্জতা! কী হ্যাংলামী!

আর সহদেব মণ্ডল, সে সমান অবিচল। —এজ্ঞে দরকার লাগবে না। পিসাতো ভেয়ের বাসায় উঠেছি।

॥ নয় ॥

তবুও—তারপর? সেই দিনটা চলে যাবার পর····

কতগুলো দিন পার হয়ে গেল। এখনও ভাবলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় তমোনাশের।

হালে পানি না পেয়ে বিদিশা কিনা সেই সারাক্ষণ খিঁচুনি দেওয়া অকর্মার ধাড়ি মেয়েটার হাত ধরে ডুকরে উঠেছিল, তোর ভরসায় কুকুর ছানাটা আনলুম রে সোনালি! আর তিনটি দিন না যেতেই তুই আমার সঙ্গে এই বেইমানি করলি?

কুকুরছানা! শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল তমোনাশ। সেটা আবার কি! সেটা যে কি পরে জেনেছিল তমোনাশ।

তা সোনালি সত্যি বেইমান নয়। সে তো প্রায় ডুকরে উঠেছিল, যেতে আমার সাধ? বাচ্ছাটাকে দুটো দিন নাড়াচাড়া করে কত মায়া পড়ে গেছে। কেমন চুকচুক করে দুধ খায়—

ভেবেছিলাম তুই আমার কাছেই বরাবর থাকবি। আমিই দেখেশুনে তোর ভাল বিয়ে দেব। হঠাই কিনা এই ব্যাপার। তো তুই তোর বাপকে একটু বুঝিয়ে বল না।

আমি কি বুঝাব? আমারও যেতে মন নাই—বলতে গেলে ঠ্যাঙানি খেতে হবে না? আপনি বরং বলেন না।

তা সে অনুরোধও রাখতে চেষ্টা করেছিল বই কী। বিদিশা আপ্রাণ চেষ্টাই করেছে সহদেব মণ্ডলের মেয়ের বিয়ের দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে রাজি আছে বিদিশা ব্যানার্জি। রাতটা এখানে খেয়ে থেকে, মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে পুনর্বিবেচনা করে দেখুক সহদেব। তা নইলে বিদিশা মারা যাবে।

আর সহ্য করতে পেরে ওঠেনি তমোনাশ। ধমকের সুরে না হলেও একটু জোরের সঙ্গে বলে, কি আশ্চর্য! ও বলছে পাকা কথা হয়ে গেছে। বলছে ওর কাজ আছে। —এই শোন, তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে বাবু। তোমার সেই কার বাসায় যাবার কথা, যাও এখন। কাল সকালে এসে মেয়েকে নিয়ে যেও।

বলে ফেলে তমোনাশ নিজেই যেন চমকে গেল। এতবড় একটা ডিসিশান নিয়ে বসে, সে সম্পর্কে নির্দেশ জারি করা! এ তো রীতিমত অসমসাহসিকতা!

সত্যি বলতে এ হেন অসমসাহসিকতা তমোনাশের জীবনে এই প্রথম। তবে পরোক্ষে সাহস জুগিয়েছিল সেই মানুষটিই যার ভয়েই তমোনাশ সংসারের কোন ব্যাপারে নাক গলাতে সাহস করে না।

বিদিশা যদি তমোনাশের সহ্য শক্তিটার ওপর অমন জোর হাতুড়ি বসিয়ে বসিয়ে সহ্যের শেষ সীমায় এনে না ফেলত তাহলে কী তমোনাশ হঠাৎ এমন কাজটা করে বসতে পারত?

শুধু ওইটুকুই নয়, তমোনাশ সেদিন আরও সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ফেলেছিল। ওই মণ্ডলের পো-টিকে, পরিষ্কার ওই আপস বাণীটি শুনিয়েই বলে উঠেছিল, আর শোন, যাবার পথে কোথাও একটু চা খেয়ে নিও। বলে খাতা কেনার জন্যে যে দশ টাকার নোটটা নিয়ে বেরোচ্ছিল, সেটাকে পকেট থেকে বার করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছিল।

এহেন পরিস্থিতিতেও যে বিদিশা কোন ক্রুদ্ধ তিক্ত বা কটু কথার মন্তব্য করে চেঁচিয়ে ওঠেনি, সেটা বোধ হয় এই অভাবিত দুঃসাহসের দৃশ্যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল বলেই।

তা জীবনে সেই একবারই তমোনাশ বৌকে তার সাহস দেখিয়ে বিস্ময়াহত করেছিল। তা নয় তো বিস্ময়াহত ক্ষণে ক্ষণেই করে বসে বৌকে তমোনাশ, তার বোকামি দেখিয়ে, বেকুবি দেখিয়ে। অক্ষমতা অপটুতা দেখিয়ে।

সাহস দেখিয়ে? কখনো না।

তবে ওই একবারই। তার কিছু পরেই রাত্রে শুতে এসে সোনালির কান বাঁচিয়ে বিদিশা যখন বরের নাকের সামনে আঙুল তুলে বলেছিল, তোমার হঠাৎ অত মাতব্বরী করতে যাবার কী দরকার ছিল? আমি লোকটাকে প্রায় নরম করে এনেছিলুম। আর খানিকটা সময় পেলেই পটিয়ে পাটিয়ে ঠিক রাজী করিয়ে নিতুম।

তখন কী সেই কথাটা বলে উঠতে পেরেছিল? যেটা মুখে এসে গিয়েছিল? পেরেছিল বলে উঠতে—নরম করে আনতে তো পায়ে ধরতেই বাকি রেখেছিলে। সময় পেলে সেটাই করতে? না কী হাতটা আর একটু উঁচুতে তুলে, গলা ধরতে?

পারেনি। শুধু মিনমিন করে বলেছিল, বাঃ, মেয়ের বিয়ে বলে কথা। সহজে একটা পাত্র জোগাড় হয়? বলছে পাকা কথা হয়ে গেছে। এখন মেয়েকে নিয়ে যেতে না পারলে?

ওঃ! পাকা কথা হয়ে গেছে। গর্জে উঠেছিল বিদিশা, সেই গপ্পো তুমি বিশ্বাস করেছ?....তা তুমি করতে পারো। যেমন বুদ্ধি। ....আমি বলছি ওসব ডাহা মিথ্যে কথা। বিয়ে-টিয়ে নয়। ঠিক দেখবে আর কোথাও বেশি মাইনের কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

অবোধ তমোনাশ তবু বলেছিল, বাঃ, তা কী করে হবে? এই সোনালি তো তোমায় ছেড়ে যেতে চাইছিল না। কাঁদছিল।

কাঁদছিল! —থামো! ও সব নাটক আমার ঢের দেখা আছে। ....উঃ মরতে আমি আবার কুকুরছানাটাকে নিয়ে এলাম। আনা মানে উপহার বাবদ পাওয়া জিনিসটাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে বাধ্য হওয়া।

কুকুরছানা রহস্য এই। আসলে বিদিশার কোন দিনই কুকুর প্রীতি ছিল না। বরং কুকুর ভীতিই ছিল।

কিন্তু সেই সত্যটি স্বীকার করে ফেলা তো নেহাৎই গ্রাম্যতা হয়। তাই কখনো কারো বাড়ি কুকুরছানা দেখলে বলে ওঠে, ইস, কী সুন্দর! কী মিষ্টি দেখতে!

তো স্কুলের কোন এক দিদিমণীর বাড়িতে কী জন্যে যেন গিয়ে পড়ে কবে যেন ওই রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বসেছিল। তাই সেই মহিলা তাঁর পোষা কুকুরটির পরবর্তী ইসু থেকে একটি দিন কয়েক বয়েসের বাচ্চাকে উপহার দিয়ে বসেছিলেন হেড্ মিস্ট্রেসকে। অবশ্যই তোয়াজ করতে।

বিদিশা কেবলমাত্র সোনালির ভরসাতেই নিয়ে এসেছিল। আর সোনালি দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল।....সেটাই আরো ভরসার।

তা ছাড়া—নেব না বাবা, বলতে তো পারে না। আহ্লাদে ডগমগ ভাবই দেখাতে হয়েছে।

তারপর? সোনালি তো হাওয়া হয়ে গেল। কে দেখবে.... ওকে? মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে হবে না বিদিশার? ওর হা-হুতাশ দেখে তমোনাশ আর একবার একটু সাহসের আভাস দেখিয়ে বলেছিল, তা অতো কী? আর একটা লোক কী তোমার জুটবে না? ও তো তেমন কাজের ছিলও না।

শুনে সান্ত্বনা পাওয়ার বদলে আর একবার ভীম গর্জনে গর্জে উঠেছিল অশ্রুনয়না নারী।

তেমন কাজের ছিল না? ওর মতো কাজেরই একটা জুটিয়ে আনো না দেখি। জানো, চেষ্টায় বরং ভগবান মেলে, তো একটা মনের মতো কাজের লোক মেলে না।

এখন কে তাকে মনে করিয়ে দিতে সাহস করবে—অথচ তুমি সর্বদা তাকে অকর্মা বলে হ্যানস্থা করেছ। আর প্রতিপদে অসন্তোষ প্রকাশ করেছ।

ওরে বাবা! কার সাধ্য? কে জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে যাবে? প্রজ্বলন্ত স্টোভে কেরোসিন ঢালতে যাবে? তমোনাশ আর যাই হোক এত অসাবধানী নয়।

॥ দশ ॥

পরদিন সকালে বাবা নিতে এলে সোনালি চোখ মুছতে মুছতে তার মাসিমাকে প্রণাম করতে এলো। কিন্তু মাসিমা মুখ ঘুরিয়েই শুয়ে রইলেন। দারুণ মাথার যন্ত্রণা। তমোনাশ ভয়ে ভয়ে বলল, এর মাইনে-টাইনে কিছু দেবার নেই তো?

পাশ ফেরা মুখই গর্জে ওঠে, থাকলেই বা দিচ্ছে কে? এ রকম বিনা নোটিশে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে কেউ এক পয়সাও মাইনে দেয় না, বুঝলে? আর আজ তো মাত্র মাসের ছ'দিন। কী এত মাইনে?

বলেই কী ভেবে দুম করে উঠে পড়ে ধড়াস করে আলমারি খুলে কী যেন টাকা পয়সা ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, পুরো এক সপ্তাহের মাইনে দিয়ে দিলাম, বুঝলি? দিগে যা তোর বাপকে।

মেয়েটা হেঁট মুণ্ডে সেগুলো কুড়িয়ে নেয়।

আবার তখুনি অন্য একটা আলমারি খুলে বিদিশা একখানা খুব ভালো ছাপা সিল্কের শাড়ি বার করে সেই ভাবেই ছুঁড়ে দিয়ে বলে, আর এই শাড়িখানা—বলতে গেলে নতুনই আছে, তোকে দেব বলে রেখেছিলাম।....কী? দাঁড়িয়ে রইলি যে? নিয়ে যা।

ওদিকে নিচের তলা থেকে বাপ জোর গলায় তাড়া দিচ্ছে, নেবে আয়। কত দেরী করতেছিস?

কিন্তু মেয়েটা কেমন যেন বোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ দুটো যেন কাঁচের।

তমোনাশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটা অমন আড়ষ্ট হয়ে গেল কেন? শাড়িখানা বড্ড বেশি ভালো বলে কী? দেখে তাই মনে হচ্ছে তমোনাশের। খুব জেল্লাদার।

সত্যিই কী এটাই দেবার জন্যে তুলে রেখেছিল বিদিশা? না ভুল করে অন্যটা টেনে চোখে কানে না দেখে ছুঁড়ে দিল? একখানা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শাড়ি। তবে দামী। এমন দেওয়াটা নতুন কিছু না।

মাসিমার দাক্ষিণ্যে সোনালি অনেক ভালো ভালো দামী দামী শাড়ি অঙ্গে তুলতে পেয়েছে। হলেও একটু টুটা-ফুটা।

আরো ঘাড় হেট করে শাড়িটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল মেয়েটা—তমোনাশকেও একটা প্রণাম করে। আর ফিরে তাকায়নি।

কিন্তু এ সব ঘটনা তো ঘটে গেছে বেশ কিছু দিন আগে। এত পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে আছে কী করে তমোনাশের? ব্যাপার তো সামান্য একটা কাজের মেয়ে নিয়ে। তবে কথাটা মনে পড়লেই স্মৃতির ঘরটায় একটা মেঘলা ছায়া পড়ে কেন?

তা কারণ একটা আছে। মেয়েটা চলে যাবার খানিকটা পরে দেখা গিয়েছিল সেই শাড়িখানা সে পরিপাটি পাট করে দালানে সোফার ওপর রেখে দিয়ে গেছে।....তার মানে ভুলে ফেলে রেখে যাওয়া নয়। সেটা সে গ্রহণ করেনি। আর সেই না করাটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

বিদিশা এই দৃশ্যে দারুণ জ্বলে উঠে বলেছিল, এ হচ্ছে তাকে অপমান করা! এবং সেটা বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া।

কিন্তু তমোনাশের তা মনে হয়নি। তার মনটা ভারী বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এটা অপমান নয়। অভিমান। আর সেটাই জানিয়ে যাওয়া।

এটা ভেবেই তমোনাশ হঠাৎ মনে করেছিল, এইটা নিয়ে একটা গল্প লিখতে পারা যায়।....ভালো লেখকের হাতে পড়লে হয়তো খুব উৎরে যায়। তা তমোনাশই কী চেষ্টা করতে পারে না? এটা নিয়ে একটা গল্প সে লিখবে।

কিন্তু লেখা? লেখা আর কোন দিন হয়েছে অদ্যবধি? নাঃ। হয়নি।

সেই সব লেখা এবং না লেখা কাগজের গোছাগুলো, আর ফুরিয়ে আসা খাতাখানা, যে অবস্থায় ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই অবস্থাতেই পড়ে আছে। এখনো এই কত দিন।

কিন্তু কেন? সেই খাতা কিনতে বেরোতে গিয়ে থেমে যাওয়ার পর খাতা আর কেনা হয়নি না কি?....নাঃ। হয়নি।

কী আশ্চর্য ! হয়নি কেন ? খাতা কেনার টাকাটা দাতব্য করে বসায় আর টাকা জোটেনি ?

দূর ! সেটা একটা কথা না কী ? তমোনাশ কী সত্যি বেকার ? মোটা পেনসন পায় না ? যদিও নিজের শখের খাতে বাজে খরচ করবে না—এই ধরণের একটা মানসিকতা তমোনাশের চিরকালের। তবু এটুকু অবশ্য তার বাজে খবরের আওতায় পড়ে না।

আসলে খাতার প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নই ওঠেনি আর। কী হবে খাতায় ? লিখবে কখন ? সময় কোথায় ? আর নির্জনতাই বা কোথায় ?

হায় ! সদ্য অবসর গ্রহণের পরবর্তী কটা দিন অগাধ অবকাশের সমুদ্রে পড়ে গিয়ে কী হাঁসফাঁসিয়েই উঠেছিল তমোনাশের। ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে এই অগাধ অবসরের শূন্যতাটি নিয়ে ?

তাই না কাকার কাটুম কুটুমের বাক্সটা টেনে বার করা।

কিন্তু তাতে কাকার মতো সাকসেস হতে না পারায় তেমন মন লাগছিল না। সহসাই আবিষ্কার করে বসেছিল খাতা আর কলম বলে একটা জিনিস আছে।....আর আছে—অফুরন্ত স্মৃতির সম্পদ। সেই সম্বলেই লেগে পড়েছিল।

কী ভালো লাগার স্বাদই পেয়েছিল ওই আবিষ্কারে। অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে তুলে খাতার পাতা ভরিয়ে তুলতে এত ভালো লাগে।

কিন্তু তারপর ? হলটা কী ?

সময়ের ভাঁড়ার এমন ফেল্ মেরে গেল কিসে ? আর সুযোগ ? তাই বা একদম হাওয়া হয়ে গেল কিসে ? দুপুরবেলার নির্জনতাটি গেল কোথায় ?

বিদিশা কী আর স্কুলে যায় না ? ওরও কী—বালাই ষাট ! ও তো এখনো অনেক দিন যাবে। সবে তো বাহান্ন বছরে পা ফেলেছে। অবসর কাল আসতে এখনো ঢের দিন বাকি। ওদের তো আবার শিক্ষা বিভাগ। তমোনাশের মতো আটান্ন পড়তেই দরজা দেখিয়ে দেবে না। ষাট পর্যন্ত গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে পারবে।

তাহলে ? তাহলের উত্তর হচ্ছে—এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে পালাবদল ঘটেছে তমোনাশের জীবনে।

সেই কত দিন যেন আগে—সোনালি বিদায় পর্বের পর দিন। সেই যে ভোর সকালে বিদিশা তাকে ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে বলেছিল, বাহাদুরি দেখাতে তো লোকে তাড়ালে—(হ্যাঁ, তাড়ালে শব্দটাই ব্যবহার করেছিল বিদিশা) এখন যাও, বুড়িকে দরজা খুলে দাও গে। ....আমার তো ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ি ভাঙলেই বুক ধড়ফড় করে।

সে কী! তুমি কেন ? বলে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে সাত দরজার তালা খুলতে খুলতে ছুটে গিয়ে সদরের দরজাটা খুলে দিয়েছিল তমোনাশ! সেদিন থেকে ওটা তমোনাশেরই ডিউটি। বুড়ি হচ্ছে তমোনাশদের সেই চিরকেলে বাসন— মাজুনিটি।....বয়েসের ভারে তিন কোণা হয়ে গেছে। তবু কাজ করা ছাড়বে না। সেই তিন চার বাড়ি বাসন মেজে বেড়াবে সেই গীতার মা।

বললে বলে, না খাটলে খাব কী বৌদিদি ? কুলাঙ্গার ছেলে মা বলে একটু দ্যাখে ? অতএব সে শেষরাত্তির থেকে কর্মকাণ্ড শুরু করে দ্যায়। তমোনাশদের বাড়িটাই সবচেয়ে কাছে বলে, সেটা থেকেই আরম্ভ। ভোরে দরজা খোলা না পেলে, আসবে সেই ফেরার কালে। অর্থাৎ বেলা দশটায়। বিদিশা যখন স্কুলের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কোন্ সাহসে তবে এই ব্রাহ্ম মুহূর্তটিকে হাতছাড়া করা যায় ?

দরজা খুলতে নামতেই বিদিশা দোতলা থেকেই ডাক দেয়, পাম্পটা চালিয়ে দিয়ে এসো মনে করে।

তারপর ? তারপর—দুধটা আমার কী হবে ? আমাকেই যেতে হবে না কী ?

তমোনাশ শিহরিত—সে কী! তোমায় যেতে হবে কী বল ?

অতঃপর স্বগতোক্তি, আমার গলায় তো রান্নাটি পড়ল। চায়ের জলটাও যদি একটু বসিয়ে দিতে পারতে—

আরে পারব না কেন ? ক'কাপের মতো জল বলে দাও।

দয়া করে বাজারটা একটু সকাল করে এনে দিও। একা হাতে

সব করতে হবে, সেটা মনে আছে তো ? আর শোন, মাছটা বাজার থেকেই কুটিয়ে এনো। কুটবে কে ?

শুধু মাছ নয়, এঁচোড় বা সজনে ডাটাও বাজার থেকে কুটিয়ে আনতে হয়। তাতেও সময় যায়।

সেই প্রথম দিনের পর থেকেই দিনের পর দিন। এই নিয়মেই চলছে। অতএব সকালের সময়টুকু কোন্ ফাঁকে বিলীন।

তমোনাশ ভেবে অবাক হয়ে যায় সেই নেহাৎ বালিকা নাবালিকা একটা মেয়ের বিহনে সংসারের টাইট ফিট খুঁটিটা এমন নড়বড়ে হয়ে গেল ?

এত কাজ করত সে ? যার জন্যে তমোনাশের সময়ের শূন্যতা ভরাট ? আর বিদিশা সময়ের অভাবে সারাক্ষণ দাপাচ্ছে।—যা দেখছি—ইস্কুলটা এবার ছাড়তে হবে। এভাবে—একহাতে রেঁধে বেড়ে অন্যের নৈবিদ্যি গুছিয়ে রেখে, নিজে খেয়ে দশটার মধ্যে বেরোনো অসম্ভব। এককাপ চা বানাবার মুরোদ নেই কারো।

সত্যিই অবশ্য নেই। তবু চেষ্টা করতে গিয়েছিল তমোনাশ। কিন্তু সেই চা যদি মুখে তোলার অযোগ্য হয় ? বৃথা চেষ্টায় লাভ ?

অথচ অনায়াসে সংসারটাকে টাইটফিট রেখে চালাচ্ছিল একটা গ্রাম্য ক্ষুদে মেয়ে। শুধু থাকা খাওয়া আর সামান্য কিছু বেতনের বিনিময়ে। তবু সর্বদা অসন্তোষ। তার কাছে আরো অনেক প্রত্যাশা। অনেক দাবি।....এমন কী আক্কেল, কর্তব্যজ্ঞান, মায়া মমতা ছেদ্দা।

সেকালে বালিকা বধূদের কাছে যেমন প্রত্যাশা থাকত। এবং সর্বদা অসন্তোষের শিকার হতে হত যাদের। তো তাদের খাতে তো ওই বেতনটুকুও নয়। বিনিময়ে শুধু একটু সামাজিক পরিচয়ের স্বীকৃতি। অমুক বাড়ির বৌ।

সেকালে না কি 'বৌ-কাঁটকি শাশুড়ী' নামে একটি সম্প্রদায় ছিল। তাঁরাই পরজন্মে এই সব বিদিশা রূপে জন্মগ্রহণ করেন না তো ? অতি মডার্ণ সাজ, অতীব শিক্ষিতা, বহির্জগতের সমাজে হাস্যময়ী কৌতুকময়ী লোক মনোমোহিনী। আপন ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে

ঢুকে আসা মাত্রই অন্য মূর্তি।

ঠিক যেন বাইরে পরার ঢাকাই শাড়িখানা ছেড়ে ঘরে পরার সুতি ছাপাশাড়িটা জড়িয়ে ধাতস্থ হয়ে বসা।

যে তমোনাশ অফিসের ফাইল ছাড়া আর কিছু জানত না, সেই তমোনাশ যে কী করে সর্বদা এমন নানা ভাবনা ভেবে চলে। আর এমন তুলনামূলক ভাষ্য আবিষ্কার করে বসে।

তা বাঁশের ফুলও তো ফোটে। সদ্য যৌবনে নয়, হয়তো বা পরিণত কালের প্রাক্কালে। তমোনাশেরও হয়তো এই ঊনষাটে এসে সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ হচ্ছিল।

বাঁশের গোড়াটাতেই কোপ পড়লে, আর কী হবে?

দুপুরের নির্জনতায় অক্ষরের জালে জড়িয়ে গিয়ে আত্মবিস্মৃতির আচ্ছন্নতার ওপর যদি ঠাঁই করে একখানা থান ইঁট পড়ে।....বাড়িতে একটা আস্ত সুস্থ লোক বেকার বসে থাকতেও ছাদের শুকনো কাপড়-গুলো সব বৃষ্টিতে ভিজে বসে আছে? অথবা আহা, কুকুক ছানাটাকে সময়ে ভাত কটা দেওয়া হয়নি! তুমি মানুষ না কী গো? তাহলে? হংসবাহিনী মা সরস্বতী রকেট বাহনে উড়ে পালাবেন না?

কিম্বা—যাই ভাগ্যিস দরজার চাবি সঙ্গে থাকে তাই বাড়িতে ঢুকতে পাই। কেউ খুলে দেবার অপেক্ষায় থাকলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত। সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে রাখার দরকার কী? দিন দুপুরেই যখন ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে সাধ হয়?

তাহলে আর খাতা খুলতে সাহস হয়? অতএব খাতার প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন নেই আর।

কিন্তু কাজের মেয়ে একটা আর জুটল না বিদিশার সংসারে? এটা বিশ্বাসযোগ্য? সোনালি না হোক রুপোলি? তামালি?

নাঃ, একেবারে জোটেনি তা বলা যায় কখনো? বরং গণ্ডা গণ্ডাই জুটেছে। কটা দিনের মধ্যেই কত বর্ণে বর্ণালি জুটেছে অনবরত। নানা জাতি নানা রূপ নানা পরিধান। তবু একটি ব্যাপারে সকলের মধ্যে মিলন মহান। কাজ করব বলে এসে দাঁড়ায় কিন্তু সে দাঁড়ানো

পদ্মপত্রে জলবিন্দুসম।

কারো মতে এত কাজ করা যায় না। ফেলাট বাড়িতে দুখানা একখানা ছোট-মোট ঘর। আর এখানে এই পেল্লায় দোতলা বাড়ি ঝাড়া মোছা। বাবাঃ!

কারো অভিমত, এত খিটখিট সহ্য করে টেঁকা যায় না। কাজ করব পাওনা নেব এত খিটখিটিনি কিসের? কারো মতে—দুপুর বেলাটা একটু গা ছেড়ে ঘুমোতে না পেলে শরীর ট্যাঁকে, রক্ত মাংসের শরীর তো বটে।

কারো মতে—বাসন-মাজুনি ঝিকে দরজা খুলে দিতে শেষ রাত্তিরে উঠতে পারা যাবে না বাবু। তা আপনারা রাখ আর না রাখ। অতএব মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ। আবার যে মেঘ সেই মেঘ।

বিদিশার কখনো প্রসন্ন মন্তব্য—নতুন মেয়েটার রান্নার হাতটা ভালো। তবে বেশির ভাগই মন্তব্য—শেখাতে শেখাতে আমার হাড়ে দুর্বো গজিয়ে গেল। এর থেকে নিজে কাজ করা ঢের ভালো।

একজনকে হঠাৎ ভারী পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি ঝাড়া জবাব দিয়ে চলে গেলেন। মানুষের জন্যে কাজ করতে এইছি, কুকুরের সেবা করতে পারবনি। আর কুকুর দেখলে আমার ভয় লাগে।

অথচ ছানা কুকুরটাকে মানুষ, সরি কুকুর করে তুলতে সেবা যত্ন লাগবেই।

আর একবার সেই মাত্র দিনকয়েক বয়সের ছানাটা এই মাস কয়েকের হয়ে উঠে যে রীতিমত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার করা যায় না।

কাজেই সে ভারটা তমোনাশের ওপরই এসে পড়েছে। কারণ কুকুর-ভীত বিদিশা তমোনাশকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ছ'ফিট লম্বা আস্ত একটা পুরুষ মানুষ। তুমিও আঁচড়-কামড় খাবার ভয়ে

জলিকে চান করাতে ভয় খাচ্ছ? আশ্চর্য! আমার ঘাড়ে যদি রান্না না থাকত তাহলে কী আর—তাহলে কী, সেটা অবশ্য উহ্যই থাকে।

সেই স্টেজে স্কুলে যাবার কালে আর বিদিশা এ কথা বলে যেত না, সকাল করে নেয়ে খেয়ে নিও, বেশি বেলা কোরো না। বলে যেত—জলিটাকে সময়ে খেতে দিও। আর দেখো ভালো করে খেল কিনা।

তবু-তখনো—সেস্টেজেও সব ডিউটি পালন করে এবং মনে প্রাণে তটস্থ থেকেও 'হারাধনের দশটা ছেলের' শেষ ছেলেটির মতো দুপুরে একটু করে অবকাশ থাকত। সাধ হত কাগজ কলমটা নিয়ে বসি একটু।

কিন্তু এখন? এখন আবার পালা বদল। এখন আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমকও নেই। কাজের মেয়ে আর খোঁজও হয় না।

কারণ বিদিশার স্নেহময়ী মা মেয়ের কষ্ট দেখে নিজের ঘর-সংসার ভাসিয়ে দিয়ে মেয়ের বাড়িতে এসে অধিষ্ঠান করেছেন। ঘর সংসার বলতে অবশ্য নিজের পালন পোষণটুকু তা সে যাক। সে কথা আর কে তুলতে যাচ্ছে?

তিনি যখন তাঁর নিজস্ব মাল মোট সব গুছিয়ে নিয়ে এসে পড়ে সগৌরবে বলেছেন, নিজের হাত পা চারখানা থাকতে—চোখ মেলে বসে তোকে মরতে দেখতে পারব না তো মা বিদু।....কিছু না পারি তোর রান্নাঘরখানা তো সামলাতে পারব। তখন বিদু আহ্লাদে কেঁদে ফেলে বলেছিল, মা গো তুমি মা, তাই দূরে থেকেও আমার কষ্ট টের পেয়েছ।....কাছে থেকেও কী সবাই তা পায়?

তাতে যে লোকটা সর্বদা কাছে থেকে দেখে, সে আপন কর্তব্য-চ্যুতিতে মরমে মরে যাবে না?

শুধু রান্নাঘরই নয়, ভাঁড়ার ঘরটিও সামলানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই মহিয়সী জননী মেয়েকে কৃতকৃতার্থ করে এখানেই থেকে যাবেন মনস্থ করায়, মেয়ে তার পরলোকগত বাবার সঙ্গে বর্তে গিয়ে বসে আছে।

কর্মঅন্তে ফিরে এসে আর চেঁচানো শুরু করে না, কৃতার্থমন্য ভাবে বলে, উঃ! এমন আরামের জীবনটি পাব তা ভাবিনি কখনো। খেটে খুটে এসে মায়ের মুখখানি আর মায়ের হাতের যত্ন। এ যে কী জিনিস, কে তার মূল্য বুঝবে।

এমন মূল্যবান বস্তু পেয়ে আবার কে খোঁজাখুঁজি করতে যাবে একটা অকর্মার ধাড়ি আক্কেল কর্তব্যহীন হাড় জ্বালানো কাজের মেয়ে!

॥ এগারো ॥

স্নেহ বিগলিত মা অবিরত মেয়ের মুখের শুষ্কতা, কণ্ঠর হাড়ের উচ্চতা, গাত্রবর্ণের মালিন্য বৃদ্ধি দেখতে দেখতে কাতর হতে থাকলেও তিনি তো আর নিত্য সকালে দুধ আনতে দুধের ডিপোয় যাবেন না এবং মাস পড়লেই দুধের কার্ড রিনিউ করাতে যাবেন না।

সপ্তাহাতে ঝোলাঝুলি নিয়ে রেশনের দোকানে ছুটবেন তিনি? এবং কিছু নাই না বলে শূন্য ঝুলি দুলিয়ে ফিরে এসে, খোলা বাজারে কোথায় কোন্‌খানে আটা পাওয়া যায় খুঁজতে ছুটবেন?

তিনি কি ময়লা কাপড়-চোপড় থলিতে পুরে বয়ে নিয়ে গিয়ে লণ্ড্রীতে দিয়ে আসবেন? না কী লণ্ড্রীর রশিদ হাতে নিয়ে কাচানো কাপড় চোপড় আনতে যাবেন....গ্যাস ফুরোলে গ্যাসের দোকানে গিয়ে খবর দিয়ে আসতে পারবেন তিনি?

পাম্প গড়বড় করলে, পাম্প মিস্ত্রীকে ডেকে আনতে পারবেন? ইলেকট্রিক খারাপ হলে পাড়ার ইলেকট্রিক অফিসে জানান দিয়ে আসবেন নাম ধাম লিখিয়ে রেখে? কেরোসিন ফুরোলে লাইন দিতে যেতে পারবেন তিনি?....রুটির কারখানায় স্ট্রাইক বাবদ পাঁউরুটি না পাওয়া গেলে, কোথাকার কোন গলির দোকান থেকে নিদেন পক্ষে বান রুটি বা ফ্রুটি রুটি এনে হাজির করতে পারবেন?....তিনি কী জানেন এ পাড়ার বাজারে কোথায় গরম মুড়ি মেলে, কোথায় বা খই? (এ

সব তো আবার তার জন্যে নিত্য যোগান চাই এখন।)

এই সব নিত্য প্রয়োজনীয় না হলেও, অমোঘ প্রয়োজনীয়দের, প্রয়োজন মাত্রই এনে হাজির করবার ডিউটি আর কার এখন তমোনাশ ছাড়া ?

বাজারে যাওয়াটা অবশ্য কাকা মারা যাওয়ার পর থেকেই তমোনাশের কর্তব্যকর্মের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল। চটপট ভালো ভালো যা কিছু মাছ তরকারি পেত, এনে ফেলে দিত। কাজের মেয়েটাই তাদের যথাযথ ভাবে ফ্রীজে তুলে রাখত।....এখন সে কাজটা তমোনাশেরই। বিদিশা কী স্কুলে বেরোবার আগে তাকিয়ে দেখতেও সময় পায় কী এলো না এলো ? আগে হয়তো একটু তাকিয়ে দেখে নির্দেশনামা দিয়ে যেত কিছু।

এখন ? এখন—বাবাঃ। বেঁচেছি। মা আছেন। মা যা বুঝবেন, কী রান্না হবে না হবে। ওঃ মাথাটা যে কী হাল্কা লাগে আজকাল।

অপরপক্ষে ? গন্ধমাদন পর্বতের ভার তমোনাশের মাথায়।

তমোনাশকেই মাছ আনাজ একসঙ্গে আনার মেলেচ্ছাপনায় ধিক্কার খেতে খেতে আমিষ স্পর্শদোষ যুক্ত আলু পটলদের ওপর জল ঢেলে স্নান শুদ্ধ করে ফ্রীজের নিরামিষ তাকে তুলে রাখতে হয়।

তা ছাড়া আগে তো কখনো বাজার ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করতে হত না কোথায় পাওয়া যায় গাঁদাল পাতা, কোথায় পলতা পাতা।

কোথায় মেলে তাজা সর্ষেশাক আর কোথায় মেলে হিঞ্চে, সুষুনি, ওলের ডাঁটা ! এই খোঁজাখুঁজি প্রথম দফার বাজারে হয় না, হয় দ্বিতীয় দফায়।

এ সবে ত্রুটি হলে বিদিশা মুখভার করে বলে, মা আমাদের জন্যে প্রাণপাত করছেন। আর মা'র জন্যে এটুকু করতে একটু চেষ্টা করা হবে না ? আশ্চর্য !

কথায় কথায় আশ্চর্য। আশ্চর্য হওয়া বিদিশার চিরকেলে রোগ।

ছুটির দিনে তমোনাশ যদি বলে—মা রোজ খাটছেন আজকে তো তুমি রান্নাটা করতে পারো। মনে মনে তাতে যোগ করে, এক আধটা দিন তোমার হাতে খেয়ে বাঁচি।

কিন্তু যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। মা তৎক্ষণা ভর্ৎসনার সুরে বলে ওঠেন, বাবা তমোনাশ, কিছু মনে করো না, তোমাকেও বলি—মেয়েটা যে রোজ খেটে সারা হচ্ছে, ছুটির দুটো দিন আরাম করুক। এ কথা কই তোমার মনে এল না।....সাধে কী বিদু আমার দুঃখু করে, মায়া মমতা কী জিনিস তা এ সংসারে এসে পর্যন্ত জানলুম না।

বলেন। দ্বিধামাত্র করেন না। খেয়াল করেন না এ সংসারে একদা এই হৃদয়হীন তমোনাশের মা ছিলেন, কাকা ছিল। যারা বৌমা বলতে অজ্ঞান হতেন।

উনি কী দেখে যাননি কী কখনো? তা সে তামাদি কথা কী তুলতে পারা যায়?

তবু আবার যদি তমোনাশ কর্তব্য বোধে টনকো হয়ে বলে, আচ্ছা বিদিশা, মা এসে ভার নিয়েছেন বলে নিশ্চিন্তি বনে গিয়ে বসে রইলে? রান্নার লোক-টোক একটা খোঁজা হবে না?

মাতা কন্যা দুজনে একসঙ্গে বলে ওঠেন, রক্ষে কর। আবার লোক! এ বাবা কী আরামে থাকা। হাড়ে বাতাস লেগেছে।

আর কন্যে বলেন, লোক রাখলে তো মাকে আবার নিজের জন্যে রাঁধতেই হবে।

কেন? মা কী লোকের হাতে—

মা বলে ওঠেন, তা খাব না কেন বাবা? সে অহঙ্কার কী বজায় রাখতে পারব? তবে একখানা বামুনের মেয়ে জোগাড় করতে পারলে তবে তো। মুখুয্যে ঘরের মেয়ে আমি, চাটুয্যে ঘরের বউ, আর সবাই সে কথা ভুলুক আমি তো ভুলতে পারব না।

তমোনাশ মনের মধ্যে কথাটার মানে হাওড়ায় 'বামুনের মেয়ে' সেটা আবার কোন্ যাদুঘর থেকে জোগাড় করা যাবে?

সহদেব মণ্ডলের চেহারাটা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায়—আরো কত কত দাস মণ্ডল বায়েন গায়েন গড়াই বারুই ইত্যাদি প্রভৃতির কাদাখোঁচা চেহারা।

অতএব আর কী? নিয়তির নির্দেশে দিন রাত্তির ঋণ শোধ করে চলা।

এখন তমোনাশের নিত্যকর্ম পদ্ধতিটি হচ্ছে এই—কাকভোরেই দরজায় ধাক্কা শুনে গিয়ে দরজা খুলে দেওয়া। কোমর ভাঙা বুড়ির ডোর বেল-এ হাত পৌঁছায় না, তাই দরজা ধাক্কায়।....তবুও ওর অচলা নিষ্ঠার জোরেই তো বিদিশাকে বাসন-মাজার দায়ে পড়তে হয় না। কাজেই তাকে দরজা খুলতে পড়িমরি করে ছুটে যেতেই হয়। পুরুষ মানুষের তো বুক ধড়ফড় সাজে না। দোর খোলার পরেই প্রধান করণীয় বিদিশার জলিকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া। তাকে 'বড় বাইরে' সরিয়ে আনতে। নিয়ে এসে তাকে চা বিস্কুট খাইয়ে চেন বন্ধ করা।

বিদিশার কুকুর ভীতি, আর তার মা'র ছুঁৎমার্গ। চেন-এ আটকা থেকে অবিরত চেঁচায়। উপায় কী?

পরক্ষণে নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একখানা বিস্কুট চিবিয়ে চা এককাপ গলায় ঢেলে বাজারের থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়া।

ভাগ্যক্রমে একদফাতেই হল তো হল নচেৎ বিদিশা বেরিয়ে পড়ার পর আর এক দফা।

অসুবিধে কী? বাজার তো হাতের গোড়ায়। যদি দেখা যায় এত বাজার আসা সত্ত্বেও কাঁচা লঙ্কা আসেনি, অথবা একটু তেতো আনা হয় নি, তাহলে যেতে হবে না?

এ সব ছোটখাটো দরকারে কাজের মেয়েরা একপায়ে খাড়া থাকত। রাস্তায় বেরোনোই তো তাদের আহ্লাদ। দশবার পাঠালেও অরাজি নেই।

কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত একদার সরকারী অফিসের অফিসারটি....তার অবশ্য সে মনোভাব হবার কথা নয়। তবে অরাজী হবারও তো প্রশ্ন নেই।

এখন অহরহই যখন তখন ঠোঙা হাতে আর থলি হাতে, ব্যাগ হাতে কী ঝোলা কাঁধে রাস্তায় আনাগোনা। এক আধবার ক্ষীণ ভাবে মনে পড়ে, আগে পাড়ার লোকেরা তমোনাশ ব্যানার্জিকে দৈনিক দুবার দেখতে পেতেন সকাল নটায় আর সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা। দুবারই স্যুট পরা। গলায় টাই বাঁধা।

এখনও যে বাইরে বেরোতে একটু টিপটপ না হয়ে পারে না এ দেখে মায়ে-মেয়ে হাসে। বলে, এই এক বাতিক। জমাদার খুঁজতে যাচ্ছে, তবু গায়ে ফর্সা জামা চড়ানো চাই। পাড়ার আর পাঁচজনকে দেখ— বাজার যাচ্ছে শুধু লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে।

কথাটা সত্যি। এই হাতিবাগান বাজারের পাড়ায় সে ঐতিহ্য আছে। তমোনাশ পারে না। তমোনাশের অন্য এক ঐতিহ্যের ধারা।

এখন আর বিদিশা যাত্রাকালে কুকুরের কথা তোলে না, গলা নামিয়ে বলে, সময় মতো পাম্পটা আর একবার চালিও মা'র আবার একটু বেশি জল খরচের বাতিক।....না না, দাঁড়িয়ে থেকে দেখে শুনে খাওয়াতে বলছি না। জামাই মানুষ লজ্জা পাবেন। তবে খোঁজটা নেওয়া উচিত তো। আমি থাকি না তোমার একটু কর্তব্যর দায় থাকা উচিত।

বিদিশার মা মেয়ের যাত্রাকালে একটু সরে দাঁড়ান। বোধহয় ভাবেন মেয়ে জামাই একটু প্রেমালাপ করে নিচ্ছে।....আহা, বিদু আমার এমন কিছু বুড়ো হয় নি।

আর তমোনাশ ভাবে, তোমার মায়ের খাওয়ার তদারক করতে গেলে আমার প্রেসার চড়ত। গাঁদালের ঝোলের বাটির পাশে থালার ওপরকার ডাঁটা চচ্চড়িটির পরিমাণ দেখলে আর দুধ কলা মাখা ভাতের বহরটা দেখলে চোখ ট্যারা হয়ে যায়।

ভাবে। বলতে আর পারে না।

ঠিক বেরোনোর মুহূর্তে বিদিশা গলা তুলে বলে, মা একা একা কী যে একটু খাবে জানি না। খেয়ো ভাল করে।—আর এই তোমায়

জামাইকে বলে যাচ্ছি—মা'র সারাটা দিন একা মুখ বুজে পড়ে থাকা, দুপুরবেলা দুটো কথা-টথা বোলো। নয়তো টিভিটা খুলে দিও। দুপুরে অবশ্যই বাংলা কী ভালো কিছু হয় না। তবু একটু সময় কাটে তো। মা'র যে আবার দিবানিদ্রার স্বভাব নেই।

চলে যায় জামদানী শাড়ির আঁচল উড়িয়ে। দিবানিদ্রার অভ্যাস-বিহীন শাশুড়ীকে সারা দিন একা মুখ বুজে বসে থাকতে বাধ্য করার মতো অমানবিকতাই বা করা যায় কী করে।

তাঁকে তো অন্তত মুখটা খুলতে দিতে হবে। তাঁর বক্তব্যের ভাঁড়ার তো অগাধ, অফুরন্ত। দুটো ছেলেই যে তার কী অপদার্থ আর দুটি বৌ-ই কী জাঁহাবাজ, প্রসঙ্গ তুললে, থামার প্রশ্ন থাকে?

হতভাগা ছেলে দুটো যেন বৌয়ের ভয়ে কাদা। এত কিসের ভয় তা বুঝি না। তুমি বল তো বাবা, ভয়টা কিসের? তার চোখের ইশারায় ওঠা বসা। বৌ পাছে রাগ করে তাই মা'র সঙ্গে দুটো কথা কইতেও সাহস হয় না। ন্যায্য অন্যায্য কথা বলার সুযোগ নেই। ভাবো। কী কালই পড়েছে।

তিনিও যেন ট্রেন চালিয়ে যেতে পারেন, তাই যানও। তবে একটা সুবিধে, তাঁর প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিলেও চলে। শুধু মাঝে মাঝে সে কি! তাই নাকি! হুঁ দিলেই চলে।

কিন্তু তা বলে তো আর সামনে থেকে উঠে চলে যাওয়া চলে না। তবে আর কী করে তমোনাশ তার সেই অবৈধ প্রেমের হাতছানিতে সাড়া দিতে যাবে?

হায়! বিদিশার মা যদি এত স্নেহময়ী না হত। যদি মেয়ের কষ্ট দেখে বিগলিত হয়ে মেয়ের কষ্ট দূর করতে মেয়েটার মাথা কিনতে নিজের সংসার ভাসিয়ে চলে না আসতেন।

কাটুম কুটুমের বাক্স আর কোন দিন আলমারির মাথা থেকে নামেনি। ধুলোর স্তর পুরু থেকে পুরু হচ্ছে। সকাল বেলাটাও কাজে ঠাসা।

বিদিশা বেরিয়ে যেতে জলিকে শৃঙ্খল মুক্ত করে একটু বাইরে

ঘুরিয়ে না আনলে বেচারা অবোধ জীবটার ওপর অমানবিকতা দেখানো হবে না ? শেকল বাঁধা অবস্থা যে কী যন্ত্রণাদায়ক তা তো অনুভবে আছে। তমোনাশ তো হৃদয়হীন নয়।

বেড়িয়ে এনেই, বিদিশার এনে রাখা বাজার সেরা ডগ সোপখানা নিয়ে তাকে স্নান স্নিগ্ধ করতে বসতে হয়।

তারপর ? সিঁড়ির তলায় জনতা স্টোভ জেবলে জলির জন্যে নিয়ে আসা মাংসর ছাঁটটা রান্না করে রাখতে হয়।

সেটাকে তো আর বিদিশার মা'র সামনে রান্নার প্রেসার কুকারে বানিয়ে নেওয়া যাবে না। যাক, তারপর জলিকে যথা সময়ে খেতে দেওয়া এবং দেখা যে ভাল করে খেল কী না।

তারপর ? তারপর কী যেন ? নাঃ, খেই হারিয়ে যাচ্ছে।

জলির গায়ে সাবান ঘসতে ঘসতে ভাবতে থাকে তমোনাশ—দাদু গৃহবিগ্রহ, ঠাকুরসেবায় খেয়াল করিনি বলেই কি এখন এই গ্রহ কুগ্রহ, কুকুরসেবার ডিউটি ?

ভাবতে ভাবতে চমকে ওঠে—কুকুর বলে ঘেন্না করছি ? মহাপুরুষের বাণী মনে পড়ছে না ? মনে নেই সেই মহতি বাণী ? "বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন—"

তার মানে তমোনাশ এখন ঈশ্বর সেবাই করছে ! তবে আবার দুঃখ কিসের ? নাঃ, আর দুঃখবোধ নয়।

একটাই যা দুঃখ, যদি একটু সময় পাওয়া যেত।....সময় পেলেই যে তমোনাশ তরতরিয়ে এগিয়ে যেতে পারত সে বিষয়ে তমোনাশ ষোলআনা বিশ্বাসী।

ষোলআনার যুগ কবে চলে গেছে, তবু সেই ছেলেবেলায় শোনা চলতি প্রবাদগুলো মনে এসে যায় এখন তমোনাশের। অতীতমুখী মন হলে যা হয়।

তা নইলে, কেবলই মনে পড়ে যায় কেন বর্তমানের সেরা লেখকদের সারির সামনের সারে দাঁড়ানো জনেদের মধ্যে একজন, সমীরণ মজুমদার

একদা ক্লাসে তমোনাশের থেকে অনেক কম নম্বর পেত! একবার না ক্লাস প্রমোশনে আটকে গেছিল? হুঁ! গিয়েছিল, ওর বাড়ি থেকে অনেক আবেদন নিবেদন করায় সে যাত্রা উদ্ধার হয়েছিল।

কথাটা বেশি করে মনে পড়ল যেদিন টিভিতে দেখল কোন এক সাহিত্যগোষ্ঠি সমীরণ মজুমদারের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে ঘটা করে সম্বর্ধনা দিচ্ছে। শিশির মঞ্চে না রবীন্দ্র ভবনে কোথায়। সমীরণের গলায় ফুলের মালা, মুখে বিনীত হাসি। মানপত্র পড়ে শোনালেন উদ্যোক্তাদের কর্ণাধারটি। আর উপহার দ্রব্য তুলে দিলেন কোন এক মন্ত্রী। দেখতে দেখতে তমোনাশের চেঁচিয়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করছিল—তোমাদের ঐ সমীরণ আমার একদার সহপাঠী। আমার থেকে অনেক কম নম্বর পেত। ভাগ্যিস ঘরে বসে দেখছিল। সভায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেলে হয়েছিল আর কি।

আর সেই দৃশ্যটি দর্শনের পরেই তমোনাশের মধ্যে আর এক জীবন দর্শনের সঞ্চার হল। যে দর্শনটির বাণী শুনেছিল কোন মাস্টার মশাইয়ের কাছে।

সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে উদ্যম। সুযোগ সুবিধা আসার মুখ চেয়ে থাকলে হয় না।

তমোনাশ ঠিক করল শত অসুবিধাতেও সে আবার নবোদ্যমে লেগে পড়বে। কে বলতে পারে ভবিষ্যতে কোন সাহিত্যগোষ্ঠী তমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনার আসর বসাতে মঞ্চ সাজাবে কি না!

॥ বার ॥

সুযোগ সুবিধা আসার প্রত্যাশায় বসে থাকা নিষেধ তবু তমোনাশ মনে মনে ডেকে চলে। যদি হঠাৎ বিদিশার ভাইদের মধ্যে শুভ-বুদ্ধির উদয় হয়।....যদি সেই শুভবুদ্ধির তাড়নায় তাদের স্বর্গাদপ গরীয়সীকে নিজেদের কাছে নিয়ে গিয়ে মাথায় করে রাখে।....যদি

আবার হঠাৎ কোন এক অতি করিৎকর্মা, অতি ভাল, অতি নম্র, বাধ্য, ভব্যযুক্ত কাজের মেয়ে জুটে যায় আর যদি সেই মেয়ের মধ্যে দারুণ কুকুর প্রীতি থাকে।....যদি....যদির সংখ্যা বেড়েই চলে।

তমোনাশ তার লেখাটা মনে মনে লিখতে থাকে। যদি বা যখন একটু সময় পেয়ে যায় লিখে ফেলবে কাগজের গায়ে।

তো এর মধ্যে হঠাৎ একদিন এক শুভ সংকেত! বিদিশার মা'র ডাক পড়ল ছোট ছেলের বাড়ি থেকে। বধূ সদ্য প্রসূত অথচ সামনে এম. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি। বাচ্চা সামলে পড়া তৈরি সম্ভব হচ্ছে না। অতএব পুত্রের মাতৃভক্তি উথলে উঠেছে।

মা আর কতদিন মেয়ের বাড়ি বসে থাকবে? এবার ছেলের বাড়িতে চল।

ব্যস, মা কৃতকৃতার্থ বিগলিত।

বিদিশা অবশ্য খুব ধিক্কার দিয়ে বলল, নিয়ে যেতে চাইছে তো বাচ্চার আয়ার কাজ করাতে—তবু নাচতে নাচতে যাবে? বলিহারী।

মা বিরস বদনে বললেন, এখন আর আমাকে কে মহারানী পোস্ট দেবে মা! যেখানেই থাকব রাঁধুনি চাকরানী ঘরগুছুনি কী আয়ার পোস্টেই থাকতে হবে।

শুনে মেয়ে গুম হয়ে গেল। মা ভারি মুখে ছেলের শালার নিয়ে আসা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

তমোনাশের শাপে বর।

এও তো একটা প্লট। তমোনাশের স্টক বাড়ে। তমোনাশের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে। অহরহই সে লেখার উপাদান পেয়ে যাচ্ছে। এই সবই তো লেখে লেখকরা। মানব চরিত্রের কাঠামো উদঘাটন। যত পর্দা সব ফর্দাফাই করে ছাড়া। এই তো?

এমন কিছুই না। শুধু কাগজ কলম নিয়ে বসতে পেলেই তা অগাধ একটা সুযোগ তো পাওয়া গেল। নিভৃত নির্জন দুপুরটি এসে গেল হাতের মুঠোয়। সেই অমূল্য সম্পদ।

সেদিনই তমোনাশ সেই অলৌকিক ভাবে পেয়ে যাওয়া দুপুরটিতে

ড্রয়ারটি খুলে টেনে বার করল সেই খানিক লেখা আর বাকি কিছু না লেখা কাগজের দিস্তে। আর খাতাখানায় হাত বুলিয়ে ধুলো ঝাড়ল। আর পেনের পেটটা কালি ভরে রাখল।

না, ডট পেনে লিখে সুখ পায় না তমোনাশ। কালি ভরা পেন যেন তেল ভরা গাড়ি। খুব দামী পেন এটা। ফেয়ারওয়েলের সময় অফিস থেকে পাওয়া।

সব প্রস্তুত। কাল থেকে শুরু। এখন শুধু অপেক্ষা বিদিশার স্কুল থেকে ফেরার মহামুহূর্তটি।

এসেই কী কী ত্রুটি তার চোখে পড়বে কে জানে।....মা, থাকতে কোন কিছু নিয়ে টু শব্দটি করত না। পাছে সেটা মায়ের গায়ে লাগে।

তা ছাড়া আসামাত্রই মেয়ের তেতে পুড়ে আসার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই হাতে লেবু মিছরীর ঠাণ্ডা সরবতের গেলাস। আবার তারপর গা ধুয়ে এসে বসা মাত্রই গরম চায়ের কাপ। মেজাজের পারা সমেই থাকে। আজ পরিস্থিতি অন্য।

কিন্তু কী আশ্চর্য! আজ বিদিশা বাড়ি ঢুকে এল আহ্লাদে ভাসা মুখ নিয়ে। হাতে একটা খোলা চিঠি।....চিঠি পত্র এই বিকেলে বিদিশা বাহিত হয়েই আসে। কারণ লেটার বাক্সের চাবি থাকে তার ব্যাগে। আর কার দরকারই বা? চিঠি যা আসে বিদিশারই। তমোনাশকে কে চিঠি দিচ্ছে!

মেয়েরা? মোটেই না। সবই মাকে। কাজেই ধরা যাচ্ছে মেয়েদেরই কারও চিঠি এসেছে। কিন্তু এত আহ্লাদ ভাব? সুখবর আছে নিশ্চয় কিছু। কি সেটা?

কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে ওঠে বিদিশা (যেটা তার স্বভাবই না), আজ দু-দুটো সুখবর। ওঃ! তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না। এক নম্বর হচ্ছে আমাদের স্কুলের মাধুরী ঘোষ, আজ সে একটা ভীষণ ভাল কাজের লোক যোগাড় করে দিল। ওঃ, আজই —হাতে হাতে। সকালে মা'র সেই কথা শুনে পর্যন্ত যা অপমান অপমান লাগছিল।

তমোনাশ এ প্রসঙ্গে না গিয়ে বলে, লোকটা ভীষণ ভালো কী করে জানলে ?

আরে বাবা। জানি না ?

মাধুরীর মুখে ওর বোনের বাড়ীর ওই কাজের মেয়েটার প্রশংসা শুনতে শুনতে সবাই অস্থির।....যেন একটা রত্ন। তা বোনের বর হঠাৎ উড়িষ্যা না মধ্যপ্রদেশে বদলি হয়ে যাচ্ছে, কাজেই বাধ্য হয়েই কাজের মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে যেতে হচ্ছে। নিয়ে যাবার জন্যে ঢের খোশামোদ করেছিল, তা মেয়েটার এখানে রুগ্ন মা, বুড়ো-বাপ, কি করে যাবে ? সব থেকে সুখের যে মেয়েটা ডিভোসী। শ্বশুর-বাড়িতে খুব যন্ত্রণা। অত্যাচারের জ্বালায় পালিয়ে এসেছিল। কাজেই এক্ষুনি বাপ এসে মেয়ের বে ঠিক করেছি বলে নিয়ে যেতে পারবে না।

এই চলন্ত মেল ট্রেন থেকে আরো উদ্ধার করে তমোনাশ। মাধুরীর বোনের বাড়িতে একপাল কুকুর। ওই মেয়েটাই তাদের মানুষ করেছে। খুব মায়া। কুকুরদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে কাঁদছে।

এর পরেও তমোনাশ, ভগবান আছেন কী নেই ভাবনায় সন্দেহগ্রস্থ হবে ? কবে আসবে সেই বিপত্তারিণী। কবে আবার। কাল সকাল থেকেই।

ওঃ! তমোনাশ মনশ্চক্ষে দেখতে পায় তরতরিয়ে চলেছে তার কলম। সাদা কাগজের দিস্তে ভরে উঠছে কালো পিঁপড়ের সারির রেখায়।

কিন্তু তারপর ? তারপরই যে একটি বোমা ফাটাল বিদিশা। হাসতে হাসতে, আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে—আর দ্বিতীয় সুখবরটা কী বল তো ?

কী করে বলব ?

আন্দাজ কর।

আমার অনুমান শক্তি অত প্রখর নয়।

পারলে না তো ?

নাঃ।

তবে শোন—তুনতুন লিখেছে—

তা যা লিখেছে, তা তমোনাশ সারাদিন ধরে অনুমান করতে চেষ্টা করতে থাকলেও সফল হত না।

লিখেছে—তুনতুনের বর বিক্রমকে অফিস থেকে কলকাতায় বদলী করে দিয়েছে, সামনের সপ্তাহেই চলে আসছে।

চলে আসছে মানে? কোথায়?

কোথায় আবার? এখানেই।

তুনতুন পরিষ্কার করে লিখেছে, অফিস থেকে অবশ্য আবাসন বাবদ মোটা ভাতা পাবে, কিন্তু আমিই ওকে বলে দিয়েছি, আমাদের নিজেদের দোতলা একখানা বাড়ি থাকতে, তুমি আবার ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়াবে কী? কলকাতায় একখানা ফ্ল্যাট পাওয়া এত সোজা?

বিদিশা আনন্দে লালচে হয়ে বলে, ঠিকই বলেছে তুনতুন কী বল? এত বড় বাড়িখানায় আমরা মাত্র তো দুটো প্রাণী। ইস, ভাগ্যিস দোতলাটা একটু ভদ্রস্থ করে রাখা হয়েছে।....ওদের কাছে অবশ্য কিছুই না। তবু মন্দের ভালো। তাছাড়া বিক্রমকে তো কেবলই ট্যুরে যেতে হয়। সে হিসেবে একটা নেহাৎ বাচ্চা নিয়ে তুনতুনের একা থাকা।....আর এ হচ্ছে একেবারে দুর্গের মধ্যে থাকা। কী বল?

মেল ট্রেনখানাকে চালাতে চালাতেই স্নানের ঘরের দিকে এগোয় বিদিশা। দ্যাখ কী আশ্চর্য যোগাযোগ, কালই সেই দুর্দান্ত ভালো কাজের মেয়েটাকে পেয়ে যাচ্ছি।....ও তুনতুনের কপালেই।

কিন্তু তুনতুন কে? কে আবার? তমোনাশের সেই অতি ফ্যাসানি আদিখ্যেতার জাহাজ মেজ মেয়েটা।....আর বিক্রম হচ্ছে অতি নাক উঁচু অতি ইঞ্জিনীয়ার সাহেব—মেজ জামাইটা।

যাদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না তমোনাশ। দুটোর একটাকেও না। বাপ হয়ে এমন বিরুদ্ধ মনোভাব খুবই অন্যায়। খুবই অশোভন। কিন্তু কী করবে তমোনাশ? সত্যকে তো অস্বীকার

করতে পারে না।

ওই সব সত্য-টত্য নিয়ে কত কীই তো বলতেন দাদু।....সত্যই হচ্ছে জীবনের অবলম্বন। সত্যই হচ্ছে চরিত্রের মেরুদণ্ড।

কিন্তু সব প্রাণীই কী মেরুদণ্ডী?

তবু আশাবাদী তমোনাশ আশা করতে থাকে, এমনও তো হতে পারে, হঠাৎ বদলীর অর্ডারটা ক্যানসেল হয়ে গেল। অথবা বদলীর জায়গাটা বদল হয়ে গেল। কলকাতার বদলে অন্যত্র।....এমন তো হতেই পারে।

আঃ! সেই ভীষণ ভালো, কুকুর-প্রেমী মেয়েটা কাল সকালে এসে যাচ্ছে।

তমোনাশ মনশ্চক্ষে দেখতে থাকে, তার মজুৎ থাকা কাগজপত্র আর কিছু লেখা আর কিছু না লেখা খাতারা সমস্ত কালিমা লিপ্ত হয়ে গেছে।

আবার দিস্তে দিস্তে কাগজ আনছে তমোনাশ, খাতার পর খাতা।

কলমে কালি ভরেই চলেছে। যে সব প্লটেরা মাথার মধ্যে পাক খেয়ে চলেছিল তারা অক্ষরের বন্ধনে বন্দী হয়ে যাচ্ছে।

ঝড়াঝড় বই বেরোচ্ছে। লোকে আলোচনা করছে, কে এই তমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়? নতুন নাকী? বয়েস কত? তা বয়েসটা ধরা পড়ে এক দশক পরেই—যখন কোন সাহিত্য গোষ্ঠী তার সত্তর বছর পূর্তিতে সম্বর্ধনা দিচ্ছে।

লাটাইয়ের সুতো ছেড়েই চলে। কিন্তু লাটাইটাই যদি হাত ফসকে হাতছাড়া হয়ে যায়। কল্পনার ঘুড়ি কত দূর আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে? আকাশ ভেদ করে কী?

তাই মনে হয়। আকাশ ভেদ করে। যেখানে কোন বাধায় ঠেক খাবে না।....কিন্তু তা হয় না।

এমনি বাঁশের লাটাই থেকে সুতো ছাড়া ঘুড়িদের মতই কোথাও ঠেক খেয়ে সুতো ছিঁড়ে যায়, ঘুড়ি কেটে পড়ে।

অথচ সুতো ছাড়বার প্রেরণার শুরুটা কী চমৎকার অনুকূল ছিল।

সকালবেলাই বিদিশার মাধুরী ঘোষ প্রেরিত সেই ভীষণ ভালো কাজের মেয়েটি এলো।

স্মার্ট চেহারা, কথাবার্তা ভদ্র মার্জিত। সাজসজ্জায় কলেজ গার্ল সদৃশ। হাতে ঝোলাঝুলি নয়, ঝড়ঝড়ে চেহারার চলনসই মাপের একটি সুটকেস। তার হ্যান্ডেল বাঁধা ফোল্ডিং রঙিন ছাতা।....এসে জলিকে দেখেই কোলে তুলে নিয়ে—ও মা! কী মিষ্টি! বলে আদর করতে থাকল।

বিদিশার চোখে আনন্দাশ্রু। আর তমোনাশের চোখে মুখে আহ্লাদের আলো। এমন একটা সোনালি দিন তাহলে তোলা ছিল তাদের জন্যে।

সারা দুপুর ধরে নিরুপদ্রব। শান্তিতে শুধু ভেবে চলল। একটা বড় কিছু লেখা ধরবে।

কী সেটা? উপন্যাস? ভাবতে ভাবতে একটা বিষয়বস্তু ঠিক করে ফেলে। কাল থেকেই এটা শুরু করবে। ওঃ দারুণ একখানা হবে।

বিকেল হয়ে আসছে। আজকের মতো কাগজ কলম তুলল। তোলার আগে লিখল—দাদু, মনে পড়ছে তুমি মাঝে মাঝে বলতে, জপতপ ধ্যান পুজো, সকলের ওপর হচ্ছে প্রার্থনা। প্রার্থনার মতো শক্তিশালী আর কিছুই নেই। প্রার্থনার শক্তিতে প্রতিকুল বাতাস, অনুকূল হয়ে যায়।

কী পরম সত্য!

বিক্রমের ট্রান্সফার অর্ডার ক্যানসেল হয়ে যাবে, এটা নিশ্চিত জেনে স্বস্তি করে উঠে চা খেতে উঠল। কারণ ততক্ষণ নতুন কাজের মেয়ে চা নিয়ে সামনে হাজির।

এই দ্যাখ, এখন আবার চা করলে? তোমার মাসিমা তো খানিক পরই এসে যাবেন। তখন একসঙ্গেই হতো।

তখন নয় আবার এককাপ খাবেন। চা দশবার খাওয়া যায়।

তা নয়। আবার দুবার করে—

সদ্য আসা রত্ন। একটু যত্নে রাখা দরকার। খাটুনি যতটা কমানো যায়।

তা রত্নই। হাস্যবদনে বলল, তাতে কী? চা বানাতে আমার আলস্য নেই। এখন তো জলিও খাবে।

পরম পরিতৃপ্তিতে চায়ের কাপটা হাতে তুলেছে। সতেজ ডোর-বেল, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হাঁক, টেলিগ্রাম!

টেলিগ্রাম পিওনরা যে এমন বুক কাঁপানো স্বরে হাঁক দেয়।

কার টেলিগ্রাম? কিসের বার্তা?

টেলিগ্রাম মেজ জামাই বিক্রমের। বার্তা? নতুন কিছু নয়। তারা আসছে,—(আসার কথা তো ছিলই) আগামীকাল বিকেলে দমদমে পেঁছিবে বাই এয়ার। সেই খবরটি জানিয়ে। জানিয়েছে, এয়ারপোর্টে কেউ থাকলে সুবিধে হয়।

ওঃ। সুবিধে। সব সুবিধেই এক তরফা।....মন্তব্যটি অবশ্য অনুক্তই থাকে।

এয়ারপোর্টে আবার কে যেতে যাচ্ছে? এ প্রশ্ন শুনেই বিদিশা ছিটকে উঠে বলল, কে যেতে যাচ্ছে মানে? এটুকুও তোমার দ্বারা হবে না? আশ্চর্য! তাহলে আমাকেই যেতে হয়। বলে গায়ে জল ঢালতে বাথরুমে গেল।

সেই অবকাশে তমোনাশ তার এযাবৎ কালের সব লেখা-পত্র, এবং না লেখা কাগজ-পত্রদের ড্রয়ার থেকে টেনে বার করে, ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে আবার দলা মোচড়া করে ড্রয়ারে গুঁজে রাখল—আপাততের মতো। দেশলাই কাঠিটা জ্বালিয়ে দেবার জন্যে আর কোন একটি মহা মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

বৃথা আশায় আর উদভ্রান্ত হবে না তমোনাশ। সবাইকে সব শখ মানায় না। ভেবেছিল বটে, ওই স্মৃতিকথার সূত্রে সাহিত্যের হাটে ঢুকে পড়তে পারবে। এমন দৃষ্টান্ত যখন রয়েছে।

এখন ভেবে দেখছে, পৃথবীতে যত জ্ঞানী গুণী বিদ্বান পণ্ডিতগণ যতই সত্য বিশ্বাসের বাণী বিতরণ করে গেছেন, তাদের সকলকে

ছাপিয়ে, সত্য হয়ে উঠছে, ওই কোমর ভাঙা বুড়ি গীতার মা'র জীবন দর্শনের শেষ বাণীটি—কপাল! সবই কপাল গো দাদাবাবু! কপাল ভেন্ন পথ নাই।

অতএব—হে পিতামহ, আপনার উজ্জ্বল চরিত কথাটিতে সাহিত্যের রং লাগিয়ে স্মৃতিকথা বলে লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে বাজারে ছেড়ে যেতে পারা আর হল না। যার থেকে আপনার এই অভাগা উত্তর পুরুষটির হয়তো একটা নতুন জীবন প্রাপ্তি হতে পারত।

কপালে নেই। তবে মনে হচ্ছে, ওই সব উজ্জ্বল চরিত-টরিত সম্বলে কপাল খোলবার আশা আর নেই একালে।

কাল পাল্টে গেছে। এখন আর আপনাদের মহতী বাণী-টাণী আর কাজে লাগবে না হে মাস্টারমশাইরা। আর ওহে বাঁড়ুয্যে কর্তা, এখন সাফল্যের চাবিকাঠিটা কেবল মাত্র চেষ্টা আর উদ্যম নয়, আরো কিছু। আর প্রার্থনা? সেও পরমা শক্তি নয়। বৃথা আশার বিদ্যুৎ চমক।

এ যুগের নীতি হচ্ছে যে যাকে দাবিয়ে রাখতে পারে। আর তাই রেখে দাপটের সঙ্গে দাপিয়ে বেড়াতে পারে।

অতএব, হে পিতামহ! অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে আপনাদের জীবনের ছাঁচটিকে ফিরে দেখে ফিরিয়ে আনার কল্পনাটি হয়েছিল আমার অতীব ভুল। আপনাদের আমলে মূল্যবোধ-টোধ কী সব যেন ভালো ভালো কথা ছিল? সেসব নেহাৎ বাসি হয়ে গেছে।.... হে মাস্টারমশাইরা! আপনাদের জীবন ছবি-টবি এ যুগের কোন কাজে লাগবে না। মাত্র দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে দেয়ালের শোভাবর্ধন ছাড়া। আর আপনাদের বাণী-টাণী? দেওয়াল আলমারির মধ্যে চাবিবন্ধ করে রাখাই শ্রেয় অপূজিত গৃহ বিগ্রহের মতো।

ওই সব মহৎ বস্তু অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে ওঠার সাধটা এজন্মের মতো থাক।

বুঝেই তো গেছে তমোনাশ ব্যানার্জি নামের লোকটা, মানুষ

মাত্রেই মেরুদণ্ডী নয়।

তবে আর কী করা? তমোনাশের তো আর পালাবার পথ নেই। বেঁধে মারা অবস্থাতেই পড়ে থাকতে হবে। পড়ে থাকারই বা জো কোথায়?

অবিরত মিষ্টি হাতের ছপটি খেতে খেতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হবে না? পণ্ডিত ঠাকুরদার রাখা নামের মহিমাটি বজায় রাখা নামের মহিমাটি বজায় রাখতে, হঠাৎ কোন দিন—ধুত্তোর তোর সংসার! বলে কেটে পড়তে পারবে—কোন দিন?

অথচ তুচ্ছ ওই কাজের মেয়েটা, ভীষণ ভালো সেই নতুন কাজের মেয়েটা—কী অবলীলায়—ধুত্তোর আমার বেশি মাইনার চাকরি! চব্বিশ ঘণ্টা খিটখিট! খিটখিট! মন পাওয়া ভার! মেজাজের মা বাপ নেই। রাম কহো। বলে ছিমছাম সুটকেসটি আর ফোল্ডিং ছাতাটি গুছিয়ে নিয়ে ছাপাশাড়ির আঁচল দুলিয়ে দরজা পার হয়ে চলে গেল ফিরেও তাকাল না।

———